প্রথম অধ্যায়

১৯৪৭-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ১৯৪৭-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক বাতাবরণ। এই অধ্যায়ের পরিসর কতখানি বিস্তৃত হবে তার সংকেত আছে 'পূর্ব-পাকিস্তান' শব্দবন্ধটিতে। ভৌগোলিকভাবে পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল— পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম-পাকিস্তান। যদিও পূর্ব-পাকিস্তান শব্দবন্ধটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরেই সবক্ষেত্রে প্রচলিত হয়নি। অনেকক্ষেত্রেই পূর্ব-বাংলা শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হত। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণ-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি বিল পাশ করা হয়। যেখানে পূর্ব-বাংলার সরকারি নাম হয় পূর্ব-পাকিস্তান। সে-কারণে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব-পাকিস্তান শব্দবন্ধের পরিবর্তে কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্ব-বাংলা শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে যে ভূ-খণ্ডের নাম নির্দিষ্ট হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান, প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেও সেই নাম বহাল ছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 'বাংলাদেশ' নামে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেল ১৯৭১-এ। কাজেই ১৯৪৭-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৭১-এর শেষার্ধ পর্যন্ত কালপর্বের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

যেহেতু এই অভিসন্দর্ভে বিশেষভাবে আলোচিত হবে ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি ও প্রেক্ষিতে কবিতার গতি-প্রকৃতি ও কবিদের কণ্ঠ, সে-কারণে বর্তমান অধ্যায়ে কবিতা আলোচনার বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে না। বিশেষভাবে কবিতা আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট আছে পরবর্তী চারটি অধ্যায়। অতএব এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে পূর্ব-পাকিস্তান পর্বের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ থাকবে।

১. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর এই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংখ্যাধিক্যের মতামতকে উপেক্ষা করে নিজেদের মতাদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে উদ্যোগী হন। এর জন্য প্রথমেই তাঁরা সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ ভাষার উপরে জোর দেন। মাত্র তিন শতাংশ জনগণের মুখের ভাষা উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি, যাঁদের মুখের ভাষা বাংলা তাঁরা এই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে সরব হন। শুরু হয় পূর্ব-বাংলার সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধ। পূর্ব-বাংলার জনগণ এই বিরোধিতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও তাঁদের আন্দোলনকে একটি সংঘবদ্ধ রূপ দান করার জন্য একাধিক রাজনৈতির সংগঠন তৈরি হয়। একই সঙ্গে পূর্ব-বাংলার জনগণের আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ায় জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনও তাদের কর্মসূচি শুরু করে। শুরু হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে এই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটা রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। এই দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য এই সময়পর্বকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

১.ক. রাজনৈতিক সংগঠন (১৯৪৭-১৯৫৪)

মুসলিম লীগ:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে পূর্ব-বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে দেশ বিভাগের পূর্বে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই মুসলিম লীগ সদস্য আবুল হাশিম, কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে যুগ্ম প্রচেষ্টায় বিভাগ-পরবর্তী ভারতের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের নিয়ে একটি অখণ্ড বাংলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু এই উদ্যোগ সফল হয়নি কারণ কংগ্রেসের হিন্দুনেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হিন্দু মহাসভা। এই মহাসভা বাংলাকে ভাগ করে এর হিন্দু অংশকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানায়। মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও খাজা নাজিমউদ্দিন ও মওলানা আকরম খাঁর মতো নেতারা অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করতে চান। কিন্তু এই দাবি যে মানা হবে না তা বুঝতে পেরে তাঁরা সরাসরি অখণ্ড বাংলা গঠনের বিরোধিতা শুরু করেন। ফলে বঙ্গ বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন দেশ বিভাগ পরিকল্পনার নীতিমালা অনুযায়ী বাংলার হিন্দু প্রধান এলাকার সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশ বিভাগের পক্ষে রায় দেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে অখণ্ড বাংলা গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অন্যদিকে মুসলিম লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। এ-কারণে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ঘটনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে

বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার তীব্র দাবি জানানো হয়। ১১ মার্চ পূর্ব-বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ১৯ মার্চ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পূর্ব-বাংলা সফরে আসেন। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু এ কথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু অন্য কোন ভাষা নয়।"[১] মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর এই মন্তব্যে সমগ্র পূর্ব-বাংলায় গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়। ভাষার প্রশ্নে পূর্ব-বাংলার মানুষের গণ-বিক্ষোভের ইতিহাস এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে এটুকুই শুধু বলা যায় যে, মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি জনগণ ক্রমেই আস্থা হারাতে থাকেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির কোনো শাখা বা সংগঠন ছিল না। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পূর্ব-বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি একটি পৃথক সংগঠন হিসাবে কাজ করবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কোর্ট হাউজ স্ট্রিট এবং কাপ্তেন বাজারে পার্টির শহর ও কেন্দ্রীয় অফিস খোলা হয়।[২] কমিউনিস্ট পার্টি এই সময় পূর্ব-বাংলায় কৃষকদের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে তৎপর হয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রংপুর জেলার লালমনির হাট অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির সদস্যরা এক গোপন সম্মেলন করেন। তিনদিনের এই সম্মেলনে পার্টির ভবিষ্যৎ আন্দোলন সংক্রান্ত যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল—"নবাব জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিম লীগ সরকার স্বেচ্ছায় কখনো জমিদারি উচ্ছেদ করবে না। কাজেই

কৃষি প্রধান পূর্ব-বাংলায় সুকঠিন ও সুউচ্চ পর্যায়ের গণ আন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে এবং তা একবার তুলতে পারলে পূর্ব-বাংলার সর্বত্র সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে।"[৩] ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব-বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ময়মনসিংহ, সিলেট, যশোর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড কৃষক সংগ্রাম ও বিদ্রোহ ঘটে। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি কতগুলি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে শুরু করে। তবে সরকার প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে থাকায় সংগঠনগুলি শক্তিশালী হতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব-বাংলার কৃষক সমাজে এই ধারণার প্রবেশ ঘটাতে চেয়েছিল যে, ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হলেও পূর্ব-বাংলার জনগণ কার্যত পরাধীন। তাদের উচিত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পার্টিকে সমথর্ন করা। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা পূর্ব-বাংলার জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রস্তাবে রাজি হননি বরং তাঁদের মধ্যে পার্টি সম্বন্ধে এক রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। সমালোচক বদরুদ্দীন উমরের মতে—"যে পর্যায়ে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে পাকিস্তান রাষ্ট্র উৎখাতের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল সে পর্যায়ে পূর্ব-বাংলার জনগণ স্বাধীনতাকে ঝুটা মনে করতে এবং পাকিস্তানকে উৎখাত করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। উপরন্তু আজাদিকে 'সাচ্চা' মনে করে তাঁরা পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে তাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির চেষ্টা করছিলেন।"[৪] এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম দেড়-দুই বছর কেবল মাত্র হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। ফলে সরকার এই আন্দোলনকে হিন্দু আন্দোলন তক্মা দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল। পূর্ব-বাংলার কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনে যোগ দিলে পূর্ব-বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব সংকটে পড়ে।

গণ আজাদী লীগ:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা করলে 'পূর্ব-বাংলা'র মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

তৈরি হয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে একদল তরুণ বামপন্থী যুবক জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণ আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন তৈরি করেন। যদিও শুরুতেই এই সংগঠন 'গণ আজাদী লীগ' নামে আত্মপ্রকাশ করেনি। প্রাথমিক অবস্থায় এই সংগঠনের নাম ছিল 'Peoples Freedom League"। এই সংগঠনের সদস্যরা ছিলেন—তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, কামরুদ্দীন আহ্মদ প্রমুখ। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক চাপে এই সংগঠনের নাম বদল করে 'গণ আজাদী লীগ' রাখা হয়। এই লিগের কাজকর্মের তেমন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। প্রথমে ইংরেজিতে একটা ম্যানিফেস্টো তৈরি হলেও পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তন করে বাংলায় 'আশু দাবি কর্মসূচী'[৫] নামে একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানের নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই সংগঠনের আহ্বায়ক ছিলেন কামরুদ্দীন আহ্মদ। এই লিগের কাজকর্ম নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই লিগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'Civil Liberties League'। এই লিগের বিশেষত্ব সম্পর্কে কামরুদ্দীন আহ্মদ বলেছেন—''বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে প্রথম বিবৃতি এই সংগঠনের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়।''[৬]

গণতান্ত্রিক যুবলীগ:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অগাস্টের পর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোস্টেলে আতাউর রহমান, শহীদুলাহ কায়সার, আবদুর রশীদ খানের মতো ছাত্রনেতারা পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সমবেত হয়েছিলেন। কলকাতার এই ছাত্রনেতারা এর পর ঢাকায় এসে ছাত্রনেতা কামরুদ্দীন আহ্মদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ ও অলি আহাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ইতিবাচক আলোচনার পর এই বছরের ২৪ অগাস্ট রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়। ঘটনাক্রমে এই বছরই ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের মাধ্যমে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগে'র জন্ম হয়। সদস্যরা কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই যুবলিগের দাবি ছিল স্পষ্ট। কর্মসূচিতে বলা ছিল উৎপাদন হবে ব্যবহারের জন্য, মুনাফার জন্য নয়।

প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা গ্রহণ করবে। সমস্ত সম্পত্তি শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, রাষ্ট্রের তাতে কোনও ভূমিকা থাকবে না। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। কিন্তু এই মতবাদ বিশ্বের কোথাও সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ কালের জন্য গ্রহণ করানো যায়নি। এই লিগ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ড. মোহাম্মদ হান্নান বলেছেন—"বস্তুত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগের জন্ম ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তনের শুভ সূচনার প্রথম ইঙ্গিত।"[৭]

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ:- দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় ছাত্রদের একটি সংগঠন ছিল 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ'। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর এই সংগঠনটি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে। সাংগঠনিক কোনো পরিবর্তন না হলেও শুধুমাত্র 'নিখিল বঙ্গ' স্থানে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান' বসিয়ে পূর্বের কমিটি থেকে যায়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনই ছিল অবিভক্ত বঙ্গের মুসলিম ছাত্রলিগের শেষ সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী ও শাহ আজিজুর রহমান।[৮] সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে গোলমাল সৃষ্টি হলে সংগঠনের বিদ্রোহী অংশ কমিটির নাম থেকে 'নিখিল' শব্দটি বর্জন করে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ' নামে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মুসলিম ছাত্রলিগের সাংগঠনিক কমিটির তরফে প্রথম যে কর্মসূচি পেশ করা হয়েছিল তাতে মোট দশটি আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা। বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা। স্বার্থন্বেষী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্র সমাজকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে চালিত হতে না দেওয়া। ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি।[৯] উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছাড়াও সাংগঠনিক প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ 'ছাত্রলীগের দাবী' শিরোনামে দশটি দাবিকে তুলে ধরেছিল।

এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি ছিল—স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্য পুস্তকের আমূল পরিবর্তন। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ও বর্তমান শিক্ষা-সঙ্কোচ নীতির প্রতিরোধ। পূর্ব-পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, স্থল প্রভৃতি সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে অনতিবিলম্বে পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। স্বল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। নারী শিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।[১০] সংগঠনের উদ্দেশ্য ও দাবিগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই ছাত্রলিগ কেবলমাত্র ছাত্রস্বার্থের কথা বলেনি, বরং সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জন্য দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা দাবি করে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে। সুতরাং দাবিগুলি থেকে বোঝা যায় সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এই ছাত্রলিগই প্রকৃতঅর্থে সরকার-বিরোধী রাজনীতির সূচনা করেছিল।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ’ সরকারি তৎপরতায় **১৯৪৮** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। এর তিন বছর পর **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকায় এক যুব সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ’। এই লিগের সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী, সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন অলি আহাদ। এই সংগঠন কৃষক, শ্রমিক, যুবক ও নারীদের প্রতি সরাসরি সরকারি বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অতিসক্রিয়তার প্রসঙ্গে সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছিল। তবে তারা সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে না গিয়ে তাদের চোদ্দ দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করেছিল। এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল—“**১**। আমরা যুদ্ধ চাইনা। দুনিয়ার যুব সমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের খোরাক হইব না। আমরা দাবী করিতেছি যে আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক।....২। আমরা চাই বেকার যুবক-যুবতীর চাকুরী ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারী ভাতা,....৬। আমরা চাই যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক ও

সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলাধূলার ব্যবস্থা...''[১১] ইত্যাদি। এই সংগঠন তরুণ সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। কেবল চাকরি নয়, উন্নত সমাজ গঠনের মূল স্তম্ভ হিসাবে তারা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও উন্নত করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই একথা বলাই যায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের প্রাক্-মুহূর্তে এই যুবলিগ একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রস্তুত ছিল।

আওয়ামী মুসলিম লীগ:- ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মুসলিম লীগের কিছু তরুণ কর্মী সংগঠনে স্থান না পেয়ে একটি নতুন সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ঢাকায় দু-দিনের এক সম্মেলন আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তাঁরা 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক চল্লিশজন সদস্য বিশিষ্ট সাংগঠনিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হন যথাক্রমে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হক। যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ। ভাসানীর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের দাবি ছিল—''১। পাকিস্তান খেলাফৎ অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিক্স বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হইবে, ২। পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে, ৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসাবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ৪। গঠনতন্ত্র হইবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।''[১২] এছাড়াও কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারেও তারা কিছু দাবি জানিয়েছিল। যেমন—জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, চাষযোগ্য জমি প্রজাদের বিলি, সরকারি প্রচেষ্টায় যৌথ কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা, উন্নত প্রযুক্তিতে কৃষিকাজ পরিচালনা, যুদ্ধ শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি হস্তক্ষেপ, কুটীর শিল্পের উন্নতি,

দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতিকেও তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিল। এই সমস্ত জনপ্রিয় ও গঠনশীল দাবির উপর ভিত্তি করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' পূর্ব-পাকিস্তানে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই এই সংগঠন 'পূর্ব বাংলা'র আইন সভায় বিরোধী দলের মর্যাদা অর্জন করেছিল। **১৯৫৩** খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র দ্বিতীয় অধিবেশন। এই অধিবেশনেই দলের সাম্প্রদায়িক চরিত্র বর্জন করে সংগঠনটিকে সর্বশ্রেণির জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। অবশেষে **১৯৫৫** খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'।

পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল:- ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলে'র জন্ম হয়। এই সম্মেলনে নয়টি জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলী। এই সম্মেলনের আহ্বায়ক মাহমুদ আলী তাঁর বক্তৃতায় গণতন্ত্রী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা উচিত। একই সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেন। এই সংগঠনের দাবি ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের চাপ স্বীকার না করে পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নতিকল্পে তৎপর হওয়া। সভার শেষে পশ্চিম-পাকিস্তানের 'আজাদ পাকিস্তান পার্টি'র সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' যাতে একত্রে উভয় প্রদেশের জনগণের স্বার্থরক্ষাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে পারে সেই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

১.খ. ভাষা-আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অগাস্ট ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে যে নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তানে'র জন্ম হয় তা শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান। যদিও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি নাম ছিল 'পূর্ব বাংলা'। এই প্রদেশের জনগণ সংস্কৃতিগত দিক থেকে বাঙালি হওয়ায় কারণে প্রথমেই ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ আরবি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত পাকিস্তান সরকারের কাছে উর্দু ছিল মাতৃভাষার সমতুল্য। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা উর্দুকে তাঁদের মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় শাসকের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই রকম পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক ও ছাত্রদের তরফে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, যার বিষয় ছিল-'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?', পুস্তিকাটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর গঠিত তমদ্দুন মজলিশে'র তরফে প্রকাশিত হয়।[১৩] এই সংগঠনের উদ্যোগেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এই সময় থেকেই বাংলা ভাষাভাষী জনগণের উপর নানারকম হামলা শুরু হয়। এই হামলার প্রতিবাদে মাতৃভাষার দাবি রক্ষার্থে সংগঠিত হতে শুরু করে পূর্ব-বাংলার যুব সমাজ। এদের সঙ্গে যোগদান করেন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে বিরোধী দল দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রথম প্রস্তাবে বছরে অন্তত একবার ঢাকায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন আয়োজনেরর দাবি জানানো হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল ভাষা বিষয়ক। উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণ-পরিষদের ভাষা করার দাবি জানানো হয়। প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি ২৪ ফেব্রুয়ারি আলোচিত হয় এবং তমিজউদ্দীন খানের বিরোধিতায় সেটি বাতিল হয়ে যায়। ভাষা বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ২৫ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের তৃতীয় দিনের সভায় উত্থাপিত হয়। পূর্ব-বাংলার পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণ-পরিষদের সরকারি ভাষা করার

প্রস্তাব পেশ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন পাকিস্তান যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলিম রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া উচিত। তিনি বলেন উর্দুই একমাত্র ভাষা যা পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে একত্রিত রাখতে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটিকে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন।

বাংলাকে গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ এবং বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলার বিরোধিতার খবরে ঢাকার শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই রকম বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-যুবরা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে বাংলা ভাষার সমর্থনে মিছিল বার করে। এই মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শেষ হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাসেম-এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ, ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াদা এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম গণ-পরিষদের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। একইসঙ্গে ওই সভায় গণ-পরিষদে এই রকম একটি প্রস্তাব আনার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং 'পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদ দিবস' পালন করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৪]

ঢাকাকে কেন্দ্র করে ক্রমে ভাষা-আন্দোলন একটি সংঘবদ্ধ রূপ লাভ করতে শুরু করে। তবে কেবল ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরেও বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিক এই আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা গণ-পরিষদে ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। একই দাবিতে ঐদিন বরিশালে মুসলিম ইনস্টিটিউশন হলে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি খুলনার দৌলতপুরে, দিনাজপুরে, মুন্সীগঞ্জে, পাবনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবক্ষেত্রেই বাংলাকে

রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। এইভাবে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও তার পাশ্ববর্তী জেলাগুলিতে জনমত সংগঠিত হতে শুরু করে।

গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের বাংলা ভাষা বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ২ মার্চ ফজলুল হক হলে একটি সভার আহ্বান করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহ্মদ। এছাড়াও রণেন দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম, শওকত আলী, মোহাম্মদ তোয়াদা, অলি আহাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ভাষা-আন্দোলনকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে একটি সুষ্ঠ সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য এই সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত হন শামসুল আলম। এই সংগ্রাম পরিষদের যে উপ-কমিটি গঠিত হয় তারা ফজলুল হক হলে ৪ ও ৫ মার্চ দুটি সভা করে। দু-দিনের এই সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মতো ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। কয়েকটি জায়গায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘট কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য জেলাতেও যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বগুড়ার একটি ঘটনায়। ঐদিন ধর্মঘটের সমর্থনে বগুড়াতে যে মিছিল বার হয়েছিল সেই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১১ মার্চের পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৪ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে ধর্মঘট পালন করা হয়। প্রবল বিতর্ক ও উত্তেজনার মধ্যে সরকার শেষ পর্যন্ত ভাষা-

আন্দোলনকারীদের সব শর্তই মেনে নিতে বাধ্য হয়। সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহ্‌মদ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। পূর্ব-বাংলা থেকে বাংলাদেশ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় এই ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে এই চুক্তিপত্রটি এ-আলোচনায় উদ্ধৃত হল।—

"১। ২৯ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করিতে হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া একমাসের মধ্যে এবিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়েছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষরূপে স্বীকৃত হইবে। এহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব বাংলার যে-সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সহিত আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।(খাজা নাজিমউদ্দিন এই দফাটি স্বহস্তে লিখে সই করেন, কারণ খসড়া চুক্তিপত্রে এই দফাটি ছিলনা)''[১৫]

চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ শওকত আলী ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য ছাত্রনেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬ মার্চ ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক হয়। আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তার কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করা হয়। সংশোধিত চুক্তিপত্রটি হল—

''১। ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশি বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ব বাঙলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারিত করিতে হইবে।

৩। সংবিধান সভা কর্তৃক তাঁহারা উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করাইতে অসমর্থ হইলে সংবিধান সভার এবং পূর্ব বাংলা মন্ত্রীসভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।''[১৬]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯ মার্চ তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে জিন্নাহ্ বলেন যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এই আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তার বাংলা তর্জমা—''আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে, অন্য কোনো ভাষা নহে। যে কেহ অন্য পথে চালিত হইবে সেই পাকিস্তানের শত্রু।''[১৭]

পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজ জিন্নাহ্‌র এই প্ররোচনামূলক মন্তব্যে পা না দিয়ে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল। এই ঘটনার তিন দিন পর ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্জন হলে জিন্নাহ্‌র সম্মানে বিশেষ সমাবর্তন উৎসব আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা ২১ মার্চের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি। জিন্নাহ্‌র মন্তব্যের প্রতিবাদ করে আবদুল মতিন, এ. কে. এম. আহসান প্রমুখ ছাত্রনেতা 'না না' বলে চিৎকার করতে থাকেন। ঐদিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে তিনি ১৫ মার্চের খাজা নাজিমউদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি মানতে অস্বীকার করেন। তুমুল বিবাদের জেরে এই সভা স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ভাষা-কেন্দ্রিক এই বিতর্ক ও আন্দোলন চলতেই থাকে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ৮ এপ্রিল প্রস্তাবটি সামান্য সংশোধনের পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপভাবে গৃহীত হয়—

> "(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং
>
> (খ) পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।"[১৮]

খাজা নাজিমউদ্দিনের এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালে সরকারের পক্ষে আবদুল বারি, শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ, অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী এবং সবোর্পরি খাজা নাজিমউদ্দিন এর বিরোধিতা করেন। প্রবল চাপের মুখে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নেন। ১৫ মার্চ এবং ৬ এপ্রিল খাজা নাজিমউদ্দিন-এর অবস্থান পরিবর্তনের সমালোচনা করে গাজীউল হক বলেছেন—"খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন সে চুক্তিতে একটি শর্ত ছিল যে

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং তার জন্য সুপারিশ করা হবে।...সেই চুক্তিকে যে এত শীঘ্র খাজা নাজিমুদ্দিন ভঙ্গ করবেন এবং সমগ্র জাতির কাছে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করবেন, অন্তত সুধী সমাজের কেউ তা বিশ্বাস করতে পারেননি।"[১৯] যদিও এর পর ভাষাকে ঘিরে প্রধানত ছাত্রদের যে আন্দোলন তা স্তিমিত হয়ে আসে। দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমউদ্দিন। এই সময়পর্বে দেশের অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিরতা ও সরকারি দমন নীতি উতপ্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল।

এই রকম পরিবেশে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বলেন—"প্রদেশের ভাষা কি হইবে তাহা প্রদেশবাসীই স্থির করিবে, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু।...একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না।"[২০] নাজিমউদ্দিনের এই বক্তৃতায় নতুন কিছু ছিল না। তা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ জিন্নাহ্‌র বক্তৃতার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দু-রকম হল। জিন্নাহ্ প্রথম থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধী ছিল তাই তাঁর প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজের একরকম প্রতিবাদ ছিল। কিন্তু যে নাজিমউদ্দিন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চুক্তিপত্রে সই করেছিলেন, তিনিই প্রায় চার বছর পরে বিপরীত মন্তব্য করায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ সংবাদপত্রে খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য ছাত্র ইউনিটগুলির সমর্থন দাবি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৩০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'প্রতীক ধর্মঘট' পালন করে এবং মিছিল বার করে। মিছিল শেষে এই কমিটি এক সভায়

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করে। ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি নিয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুব। এই সভায় ৪ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে সমর্থন করা হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

"১। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এই সভা ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও জনগণের সহিত নিজের চুক্তি লজ্ঘন করিয়া প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলিয়া সম্প্রতি ঢাকায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা ব্যক্ত করিতেছে।

সেই হিসাবে এই সভা খাজা নাজিমুদ্দীনকে তাঁহার অগণতান্ত্রিক ও অযাচিত ঘোষণা প্রত্যাহার করিবার বাদী জানাইতেছে।

২। বাংলা ভাষাকে হত্যার আর একটি চক্রান্ত হিসেবে বাংলায় আরবী অক্ষর প্রচলনের জন্য এই সভা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করিতেছে।

৩। ঢাকা শহরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট করিবার যে সিদ্ধান্ত ঢাকার ছাত্ররা গ্রহণ করিয়াছে এ সভা তাহার প্রতি সমর্থন জানাইতেছে।

৪। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা হইবে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের রাষ্ট্রভাষা; আর পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যদি উর্দুকে তাহাদের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে উর্দুও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইবে।

৫। এই সভা অবিলম্বে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আটক বন্দীর মুক্তি এবং জননিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাইতেছে।"[২১]

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মিছিল করে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ঐদিন বিকেলেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিমের মতো নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সভায়। একই সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার সমগ্র ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ঐদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদে'র এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কিনা সে বিষয়ে মতামত দানের প্রশ্ন ওঠে। অলি আহাদ, আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে জোর বক্তব্য রাখেন। তাঁদের সমর্থন করেন শামসুল আলম। যদিও ১১-৪ ভোটে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' সিদ্ধান্ত নেয় যে ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে না। অলি আহাদ সংগ্রাম কমিটির এই দাবি না মানলেও এই সিদ্ধান্ত যে গৃহীত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গাজীউল হকের স্মৃতিচারণায়—''জনাব অলি আহাদের বক্তব্য শুনে জনাব আবুল হাশিম রাগত স্বরে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্রসভা হবে সে ছাত্রসভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করবেন। যদি তবুও ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙে তবে স্বাভাবিকভাবে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদে'র বিলুপ্তি ঘটবে। জনাব আবুল হাশিমের এই বক্তব্য প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।''[২২] ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ছাত্রদের সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল দশটার সময় সভা শুরু হয়। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে এই সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্রদের পূর্ববঙ্গ

বিধান পরিষদ ঘেরাও করার কথা ছিল। সে-জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় গেট দিয়ে বেরিয়ে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু সেখানে কড়া পুলিশ পাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা বেলা ১ টার সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেট থেকে সরে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল গেটে জড়ো হচ্ছিল। বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় ছাত্রছাত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল গেট থেকে রাস্তায় জড়ো হওয়ার প্রস্তুতি নিলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই নিহত হন আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন। এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে এম. আর. আখতার মুকুল জানিয়েছেন—"একুশে ফেব্রুয়ারী বেলা ঠিক তিনটা দশ মিনিটের সময় আকস্মিকভাবে একদল সশস্ত্র পুলিশ হোস্টেল গেটের মধ্যে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ করলো। ঘটনাস্থলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুর জব্বার ও রফিকউদ্দীন নিহত হলো। রাস্তায় পড়ে থাকা কয়েকটা অ-ছাত্রের লাশ পুলিশ ট্র্যাকে নিয়ে গেলো। সে রাতেই হাসপাতালে গুরুতররূপে আহত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আবুল বরকত ও বাদামতলীর একটা প্রেসের কর্মচারী সালামের মৃত্যু হলো।"[২৩]

একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি চালানোর ফলে ভাষা-আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। সর্বস্তরের মানুষ গুলি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ধর্মঘটের মতো কর্মসূচিতে স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ২২ তারিখের ধর্মঘটের সমর্থনে সংগঠিত মিছিলেও পুলিশ গুলি চালায়। এই ঘটনায় নিহত হয় শফিউর রহমানসহ চারজন। ২৫ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার হন আবুল হাশিম। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়—

> "১। ২৬.২.৫২ তারিখ থেকে সাধারণ ধর্মঘট স্থগিত রাখা। ২। নূরুল আমীনের কাছে ৯ দফা চরমপত্র প্রদান। ৩। ৫ই মার্চ শহীদ দিবস ও সাধারণ ধর্মঘট ৪। ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত রাখা।"[২৪]

এরই মধ্যে ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ মিনার তৈরি হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ এই মিনার ভেঙে দেয়। বহু আন্দোলনের পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সফল হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলন। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের সাফল্য স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে উস্কে দেয়।

১.গ. গণ-পরিষদ গঠন, পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা, গণ-পরিষদের ভাঙন (১৯৪৭-১৯৫৪)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্-কালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার যে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করে তাতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় মহাদেশকেই দেওয়া হয় ডোমিনিয়ন স্টেটাস। উক্ত আইনে বলা হয় যে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে পাকিস্তানের সংবিধান হিসাবে কার্যকর থাকবে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ অগাস্ট যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে সভাপতি করে পাকিস্তান গণ-পরিষদ গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ অগাস্ট গণ-পরিষদের প্রথম সভাপতি হিসাবে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ অগাস্ট গণ-পরিষদের অধিবেশনে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া হিসাবে পাকিস্তানের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরই মধ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হলে ১৪ সেপ্টেম্বর তমিজউদ্দীন খান গণ-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান গণ-পরিষদে একটি প্রস্তাব (Objective Resolution) উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার তুলনায় পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতেই লিয়াকৎ আলী খান বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ১২ মার্চ গণ-পরিষদে ২৪ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি 'মূলনীতি নির্ধারক কমিটি' গঠন করেন গণ-পরিষদের সভাপতি তমিজউদ্দীন খান। তিনি স্বয়ং এই কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। এই কমিটি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর সংবিধান সভায় একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট' পেশ করে। এই রিপোর্টে বলা ছিল উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু আর্থিক বরাদ্দ, রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতামান ইত্যাদি বিষয়গুলি এই প্রস্তাবে না থাকায় এটি একটি ত্রুটিযুক্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্গতিহীন প্রস্তাব হয়ে পড়ে।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব-পাকিস্তানে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। অক্টোবর মাসে পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকজন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবীর সমন্বয়ে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সংগ্রাম কমিটি'। দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে বাংলা ভাষার সমর্থনে গড়ে ওঠা যাবতীয় আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার কঠোর প্রয়াস চলতে থাকে। কিন্তু সরকারের এই বিরুদ্ধতার প্রতিবাদে দিনে দিনে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে ভাষা-আন্দোলন। 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সংগ্রাম কমিটি'র বিভিন্ন সভায় ও সম্মেলনে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয় এবং সেই দাবির সমর্থনে ধর্মঘটও পালিত হয়। ধারাবাহিক বিক্ষোভের মুখে পড়ে লিয়াকৎ আলী খান 'অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট' গণ-পরিষদ থেকে প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় একটি রিপোর্টও সমালোচনার মুখে পড়ে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে পাঞ্জাবে দাঙ্গার পরে খাজা নাজিমউদ্দিনের পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর গণ-পরিষদে একটি ফর্মুলা প্রণয়ন করে যা 'মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা' নামে পরিচিত। এই ফর্মুলায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। যেখানে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেওয়া, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর ২৯-১১ ভোটে 'মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা' গৃহীত হয়। কিন্তু ২৪ নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণ-পরিষদ ভেঙে দিয়ে সমগ্র পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

১.ঘ. পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতালাভ ও জোট সরকারের শাসনকাল (১৯৫৪-১৯৫৮)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভাগের পর খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পূর্ব-বাংলায় তাদের প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হলে খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং কোনো নির্বাচনী পদ্ধতি ছাড়া নূরুল আমীনকে পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য পূর্ব-বাংলার গভর্নরকে নির্দেশ দেন। নূরুল আমীনের শাসনকালে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের শক্তিমান প্রার্থী খুরর্‌ম খান পন্নী পরাজিত হলে নূরুল আমীন অবশিষ্ট উপনির্বাচন স্থগিত রাখেন। নিয়ম মাফিক ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু পরাজয়ের আশঙ্কায় নূরুল আমীন এই নির্বাচন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে দেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে গণ-পরিষদের সহায়তায় তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন মূলতুবি রাখেন। অবশেষে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেযামে ইসলামী, যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল, খেলাফতে রব্বানী পার্টিসহ ষোলোটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী দল মিলিতভাবে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।

নির্বাচনী ঘোষণা জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাংলার প্রতিটি দল তাদের নির্বাচনী কর্মসূচি শুরু করে। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে জেতার জন্য যে কর্মসূচি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে সেখানে তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা এবং পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করেছিল। যুক্তফ্রন্ট এই নির্বাচনে একুশ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে একুশ দফা কর্মসূচি রচনা করেন আবুল মনসুর আহমদ। এই একুশ দফার প্রথম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা।

একই সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-বাংলার সার্বিক সমস্যার প্রতিকারের প্রচেষ্টার কথা তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে তুলে ধরে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়। প্রত্যাশা মতো এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এই জয়লাভের পিছনে একুশ দফা দাবির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এ-প্রসঙ্গে একুশ দফা রচনাকার আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন—"২১ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। কাজেই ২১ ফিগারটাকে চিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচিকে ২১ দফার কর্মসূচি করিলে কেমন হয়?...তাই করিলাম। অতঃপর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতার জীবন-বাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন দখল করিয়াছিল। শতকরা সাড়ে ৯৭টি ভোট পাইয়াছিল। এতবড়ো জয়ের প্রধান কারণ ছিল এই একুশ দফা। আমি নিজে ছাত্র-তরুণ ও জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া বুঝিয়াছি ২১ দফা সত্যসত্যই তাদের মধ্যে নব-জীবনের একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল।"[২৫] ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের এই নির্বাচন পূর্ব-বাংলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নির্বাচনের ফলাফলে পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ব-বাংলার জনগণের অনাস্থা প্রকট হয়ে পড়েছিল। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছিল। কারণ পূর্ব-বাংলার জনগণের আবেগকে তারা মর্যাদা দেয়নি এমনকি নির্বাচনী ইস্তাহারে বাংলাকে তারা রাষ্ট্রভাষা করার কথাও বলেনি। তাই পূর্ব-বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবির ওপরে তাঁদের আস্থা রেখেছিলেন।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে চার সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ভালো চোখে দেখেনি। তাই তারা যেন-তেন প্রকারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছে। এই সময় পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্ত শাসন দাবি করেছেন এই রকম একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই সরকার যুক্তফ্রন্টের ত্রুটি সন্ধানে ব্যস্ত ছিল।

স্বভাবতই এরকম সুযোগ সরকার হাতছাড়া করেনি। ইতিমধ্যে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব-বাংলার নতুন গভর্নর নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে ২৯ মে পূর্ব-বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব-বাংলায় গভর্নর শাসন জারি করে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন পর্যন্ত এই শাসন জারি থাকে।

প্রথম গণ-পরিষদ বাতিল হওয়ার পর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল দ্বিতীয় গণ-পরিষদ গঠনের আদেশ জারি করেন। এভাবেই দ্বিতীয় গণ-পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পূর্ব-বাংলার চল্লিশ জন এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে ৭ জুলাই মারীতে দ্বিতীয় গণ-পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গভর্নর জেনালরেল মনোনীত সদস্য এম. এ. গুরমানী। ৮ সেপ্টেম্বর একটি বিল পাশ হয়। এই বিলে পশ্চিম-পাকিস্তানকে একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়। পূর্ব-বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব-পাকিস্তান। প্রথম গণ-পরিষদের সাংবিধানিক খসড়া প্রণয়ন করার সময় বিভিন্ন কমিটি তৈরি হয়। কিন্তু এইসব কমিটি যথাসময়ে রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পাকিস্তান সরকার কোনো কমিটি ছাড়াই সাংবিধানিক খসড়া তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে। খসড়া সংবিধানটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। ৯ জানুয়ারি সরকারের আইনমন্ত্রী আই. আই. চুন্দ্রীগড় উক্ত সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি বিল গণ-পরিষদে উত্থাপন করেন। সংবিধানে পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি উপেক্ষিত হলে আওয়ামী লীগ বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। কিন্তু তাদের বিক্ষোভকে উপেক্ষা করে নতুন সংবিধান কার্যকরী হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ থেকে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একক প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। ২৩ মার্চকে পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণা করা হয়। এই সংবিধানে সরকারিভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পূর্ব-বাংলায় জোট সরকার তৈরি করে। কিন্তু এই সরকার স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে একাধিকবার জোট সরকারের মন্ত্রীসভার বদল ঘটে এবং তিনবার গভর্নর শাসন জারি হয়। একই সঙ্গে চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষোভ। এই রকম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর জোট সরকারের পতন ঘটে এবং সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।

১.ঙ. পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন, দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী (১৯৫৮-১৯৬৬)

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খানের সরকারের পতন ঘটিয়ে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন আইয়ুব খান।

সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বরখাস্ত করে সামরিক আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে। গ্রেফতার করা হয় আবুল মনসুর আহমদ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবদুল খালেক ও শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাজনৈতিক নেতাদের। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে বরখাস্ত করে ২৮ অক্টোবর নিজেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। এই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সিভিল সার্ভিসে কর্মরত বহু সিভিলিয়ানকে বরখাস্ত করা হয়। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় সংবাদ মাধ্যমের উপরেও। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের আইয়ুব খান ‘মৌলিক গণতন্ত্র আইন’ জারি করেন। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি সারা দেশে ‘মৌলিক গণতন্ত্রী’ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে মোট আশি হাজার গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়। এঁরাই ফেব্রুয়ারি মাসে গণভোটের মাধ্যমে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেন। এই ক্ষমতাবলেই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ আইয়ুব খান একটি নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন। এই সংবিধান ৮ জুন থেকে কার্যকরী হয়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। কারণ সামরিক শাসন জারির সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাই তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখানো সম্ভব হয়নি। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি দেশের নিরাপত্তা আইনে হোসেন শহীদ

সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে সামরিক শাসনে প্রথম বারের মতো প্রকাশ্য বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে। গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন, মানিক মিয়ার মতো রাজনৈতিক নেতারা। এভাবেই আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন রাওয়াল পিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সামরিক শাসনের নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ্যে তাদের দাবি-দাওয়া জানাতে থাকে। আইয়ুব খানের শাসনকালে গৃহীত সংবিধানে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষিত হয়। জনগণের মৌলিক অধিকারের কোনো উল্লেখ এই সংবিধানে ছিল না। এর পর সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে থাকে একাধিক আইয়ুব-বিরোধী জনসভা। ১৪ জুলাই জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে কূটনৈতিক কৌশলে সরকার 'Political Parties Act, 1962' পাশ করিয়ে নেয়। এই আইনে বলা হয় পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এমন কোনো আচরণ করলে সেই রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকারপন্থীরা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর করাচি শহরে মুসলিম লীগের কনভেনশন আহ্বান করেন এবং 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন।

আইয়ুব খান ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন সেই কমিশন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে স্কুল শিক্ষার ব্যয়ভারের শতকরা ৮০ শতাংশ অভিভাবকদের বহন করতে বলার পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সর্বপ্রথম বিরোধিতা শুরু করে। তারা 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস্ ফোরাম' নামে একটি সংগঠন চালু করে আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগদান করে। তখন থেকেই 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস্ ফোরাম', 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস্ ফোরামে' রূপান্তরিত হয়। এই সংগঠন ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করে। ১৭ সেপ্টেম্বর এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

ঐদিন পুলিশের গুলিতে ১ জন নিহত এবং একশো জন আহত হয়।[২৬] এই ঘটনার পর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'শিক্ষা দিবস' হিসাবে পালন করা শুরু হয়। যা আজও স্বাধীন বাংলাদেশে গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়।

এই সময় সংবাদপত্রগুলি যাতে জনমানসে সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে না পারে সে-জন্য আইয়ুব খান ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'Press and Publication Ordinance' জারি করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি সরকারি ষড়যন্ত্রে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১০ জানুয়ারি এই দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ লাভ করে। এই দাঙ্গায় নিহত হন আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং ঢাকার নরটডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক। এই দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য ঢাকায় তৈরি হয় 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহযোগিতায় 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে'র এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নূরুল আমীনকে কেন্দ্র করে এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক পরিবেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। ১৯৬৪ খিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে'র অন্তর্গত দলগুলি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে 'সম্মিলিত বিরোধী দল'(Combined opposition Party বা COP) নামে একটি জোট গঠন করে।[২৭] এই জোট ১৮ সেপ্টেম্বর মিস ফাতিমা জিন্নাহ্‌কে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করে মনোনীত করে নয় দফা নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। যেখানে সংবিধানের গণতন্ত্রীকরণ, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাহ্রাস, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির মতো উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলি মিস ফাতিমা জিন্নাহ্‌কে জয়লাভ করানোর জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক প্রচার পুস্তিকায় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা লক্ষ করা গেলেও মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে পুনর্নির্বাচিত করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ২১ মার্চ জাতীয় পরিষদ এবং ১৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাচনী রায় আইয়ুব খানের অনুকূলে যায়। কারণ সরকারি আনুগত্যলাভের জন্য অধিকাংশ মৌলিক গণতন্ত্রী সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে বেশিরভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী সরকারি দলে যোগদান করেন। আইয়ুব খানের এই নিবাচর্নী ব্যবস্থার সমালোচনা করে আবুল ফজল হক বলেছেন—"এই নির্বাচন ইহাই প্রমাণ করে যে, মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে আইয়ুব খানকে অপসারিত করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একনায়কতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার এক সাংবিধানিক কৌশল। আইয়ুব খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি বিশেষ স্বার্থ ও সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হন এবং এই প্রথার কোনোরূপ পরিবর্তন তাহাদের নিকট কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য ছিলনা।"[২৮] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল সাফল্যলাভের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও সাফল্য লাভ করার পর আইয়ুব খান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে তিনি রাশিয়া সফর করেন। জুন মাসে লন্ডন কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন। এরই মধ্যে ভারত সংবিধানের ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারা প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে ভারতের স্থায়ী অঙ্গরাজ্য করতে উদ্যোগী হলে পাকিস্তান এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। কাশ্মীর সমস্যা দুই দেশের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ৯ অগাস্ট থেকে ভারত অধীকৃত একালায় তৎপরতা শুরু করে। ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের সৈন্যবাহিনী লাহোর সীমান্ত আক্রমণ করলে ভারত-পাক সংঘর্ষ শুরু হয়। জাতিসংঘের নির্দেশে ২২ সেপ্টেম্বর উভয় দেশ যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়।[২৯] এই যুদ্ধে কাশ্মীরের একটা বড়ো অংশ ভারতের অধীনে চলে যায়। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের দুটি প্রদেশে দু-রকম হয়। পূর্ব-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বিচ্ছিন্ন ও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন থাকায় যুদ্ধের সময় পূর্ব-

পাকিস্তান প্রশাসনিকভাবেও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই রকম রাজনৈতিক সংকটজনিত পরিস্থিতিতে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন করে মাথা চাড়া দেয়।

১.চ. পূর্ব-পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬-১৯৭১)

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়। এ-বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাপেক্ষা তৎপর হয়ে ওঠেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ে 'ছয় দফা' কর্মসূচি রচনা করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধীদল সমূহের কনভেনশনে 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচী' শিরোনামে তিনি তাঁর 'ছয় দফা' দাবি উপস্থাপন করেন। কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত নেতারা এই দাবিকে নাকচ করে দেন। ৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই 'ছয় দফা' দাবির কথা প্রকাশিত হলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিরোধের সূচনা হয় কারণ দলের অনেক নেতা এই 'ছয় দফা' দাবির কথা জানতেন না। নানা মতবিরোধের পর ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ এই 'ছয় দফা' দাবিকে দলীয় দাবি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচী' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।[৩০]

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কর্মীসভায় এবং ১৮ ও ১৯ মার্চ দলের কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করে। 'ছয় দফা' দাবি অচিরেই সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে আইয়ুব খানের সরকার দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তাঁর গ্রেফতারির পরে ছাত্রছাত্রী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একটি অংশ 'ছয় দফা' দাবি সমগ্র প্রদেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং শেখ মুজিবুরের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই ধর্মঘটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একাধিক ব্যক্তি নিহত হয়, গ্রেফতার করা হয় অসংখ্য আওয়ামী লীগ কর্মীকে।

শেখ মুজিবুরের 'ছয় দফা' দাবির জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে আইয়ুব খানের সরকার আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের জেলবন্দি করলে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন হঠাৎই স্থগিত হয়ে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আওয়ামী লীগ, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলামী পার্টি সম্মিলিত ভাবে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' গঠন করে।[৩১] এই সংগঠন সেপ্টেম্বর মাসে আট দফা দাবির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। তারা তাদের আট দফা দাবির মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের আর্থিক বৈষম্য, জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর জোর দেয়। একই সঙ্গে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর এই আট দফা আন্দোলন আসলে মুজিবুর রহমানের 'ছয় দফা' দাবির বর্ধিত সংস্করণ। এখানে পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি অধিকতর স্পষ্ট হওয়ায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আইয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বলে উল্লেখ করেন। এর পরই উভয় দলের বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের সমর্থনে পূর্ব-পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্রে সরকারি কর্মচারি ও রাজনৈতিক নেতাসহ মোট আটাশ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' হিসাবে চিহ্নিত হয়।[৩২] ১৮ জানুয়ারি অপর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। প্রতিরক্ষা আইনে তিনি প্রথম থেকেই জেলবন্দি ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ২২ জানুয়ারি বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হয়। আসামীরা সকলেই নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। শেখ মুজিবুর রহমান একে সাজানো ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। এই মামলার পিছনে আইয়ুব খান সরকারের একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, রাজনৈতিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে অপ্রাসঙ্গিক করে

দেওয়া। দ্বিতীয়ত, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ধ্বংস করা। তৃতীয়ত, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সরকারের পদক্ষেপ পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনকে আরও সংঘবদ্ধ করে তুলেছিল।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল এবং সভার আয়োজন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি জানানোর পাশাপাশি তাঁরা জনগণের মৌলিক অধিকার, জরুরি অবস্থার অবসান, দেশরক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবি জানান। ৬ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক সভার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনের ডাক দেন। এর প্রতিবাদে আইয়ুব খান ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এক বক্তৃতায় বিরোধী দলের এইসব কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন। ১৩ ডিসেম্বর আইয়ুব খানের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলি ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। গ্রেফতার হন পাঁচ শতাধিক রাজনৈতিক কর্মী। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলে। ২৮ ডিসেম্বর এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা ঘোষণা করে—‘‘সরকার ছাত্র নির্যাতন, গুণ্ডামী, শিক্ষায়তনে পুলিশ মোতায়েন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রসমাজের হণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহারা বলেন ‘সংগ্রামী ছাত্রসমাজ’ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না।’’[৩৩] এই দুই সংগঠন মিলিতভাবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ‘ছাত্র সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করে এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি অনুসারে এগারো দফা দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ডাক দেয়। তারা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধের পাশাপাশি শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দান, ছাত্র বেতন অর্ধেক কমানো, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান, নারী শিক্ষার অধিকার, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, মেডিক্যাল

কলেজ স্থাপন প্রভৃতি জনপ্রিয় শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি জানায়। একই সঙ্গে 'ছয় দফা' দাবিকে তারা সমর্থন জানায়। এ-কারণে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'র এই দাবি পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ঘটনায় আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন ছাত্র সমাজের হাতে চলে যায়। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি আটটি বিরোধী দল একত্রে 'ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি' সংক্ষেপে 'ডাক' (DAC) নামে বিরোধী জোট গঠন করে। তারা তাদের কর্মসূচি আট দফা দাবির মাধ্যমে তুলে ধরে।

তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি ছিল—ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম; খ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, গ) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল প্রভৃতি।[৩৪] ১৪ জানুয়ারি ভাসানী ঢাকার এক সমাবেশে জনগণের কাছে সরকারি খাজনা বন্ধের দাবি জানান। এইভাবে ধারাবাহিক আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করলে পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠি চালায়। ১৮ জানুয়ারিও এই আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ২০ জানুয়ারি ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। এই ঘটনায় ছাত্র আন্দোলন সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ছাত্র আন্দোলন ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ২১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে মিছিলে বাধা দিলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। ঐদিন চট্টগ্রামে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম আহ্বান কমিটি ঢাকায় 'কৃষ্ণ দিবস' পালন করে। ৭ ফেব্রুয়ারি ভাসানী আইয়ুব খানের গোল টেবিল প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এগারো দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা তাদের এগারো দফা দাবি আদায়ের জন্য রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করে। ঐদিন তারা ১৪ জানুয়ারিকে '১১ দফা দিবস' হিসাবে পালন করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে ভাসানী এগারো দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে চরমপত্র ঘোষণা করেন। এমনকি দাবি আদায়ের প্রয়োজনে তিনি অনিয়মতান্ত্রিক সহিংস আন্দোলনের ডাক দেন। বিরোধী দলের

চাপের মুখে সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা নিহত হলে সমগ্র প্রদেশে গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়। এই আন্দোলনের চাপে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে আগামী দিনে এগারো দফা দাবি বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানালে শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেন—''আমি ছাত্রদের ১১ দফা শুধু সমর্থন করি না এর জন্য আন্দোলন করে আমি পুনরায় কারাবরণ করতে রাজী আছি।''[৩৫] ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ থেকে ১৩ মার্চ রাওয়াল পিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের এগারো দফা এবং তাঁর দলীয় 'ছয় দফা' দাবি উপস্থাপন করেন। এই বৈঠকে আইয়ুব খান কেবল ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের দাবি মেনে নেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই দাবি প্রত্যাখান করেন। কিন্তু ভাসানী আইয়ুব খানের এই দাবি মেনে নিলে আওয়ামী লীগ 'ডাক' জোট ত্যাগ করে। এর ফলে 'ডাকে'র ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ২১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এগারো দফা ও ছয় দফার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রয়োজনীয় খসড়া তৈরি করে প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থাপন করেন। এই ঘটনায় ভীত হয়ে আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে না দিয়ে ২৪ মার্চ এক চিঠিতে পাকিস্তানের মেজর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে তুলে দেন। ফলে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।

সামরিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে ইয়াহিয়া খান ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে এবং ১০ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে দেশে সামরিক আইন জারির পিছনে কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় নেই বরং প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই সরকারের লক্ষ্য। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ অগাস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাদের সংশোধিত 'নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা' করে। তাদের এই নীতির মূল কথা ছিল সুবিচার ও ন্যায়নীতিভিত্তিক এক নতুন সমাজ

ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান কায়েম সম্ভব হয়। শাসনতান্ত্রিক আদর্শ হিসাবে তারা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করার সম্মতি জানায়। এছাড়াও মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর তারা জোর দেয়। ১৬ নভেম্বর পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘকাল ধরে যে দাবি জানিয়ে আসছিল এই রিপোর্ট তাদের সেই দাবিকে মান্যতা দেওয়ায় সরকার চাপে পড়ে যায়। ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর দেশের জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে যাতে রাজনৈতিক দলগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে সামরিক আইন তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত সভায় কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহ পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীন করার আহ্বান জানান। ২ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে সরকার-বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল্লাহকে গ্রেফতার করা হলে সংগঠনের কর্মীরা মশাল মিছিলের মাধ্যমে পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলেন। ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি 'Legal Frame Work Order'-এর মূল বিষয়গুলি আলোচনা করেন।

আসলে এই 'Legal Frame Work Order' ইয়াহিয়া খানের একটি কূটনৈতিক কৌশল ছিল। এই আদেশনামায় বলা ছিল নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের একশো কুড়ি দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করবে, তা না হলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হবে এবং পুনরায় দেশে সামরিক আইন জারি হবে। আইয়ুব খানের মতো ইয়াহিয়া খানও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ধরে নিয়েছিলেন আসন্ন নির্বাচনে কোনো

দল সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পাবে না। ফলে একশো কুড়ি দিনের মধ্যে সরকার গঠন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। পুনরায় দেশে সামরিক শাসন জারি করা সুবিধা হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের এই ত্রুটিপূর্ণ আদেশনামা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল দু-দিনের বৈঠকে এই আদেশ সংশোধনের সুপারিশ করে। ৫ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এই আদেশের প্রতিবাদ করে এগারো দফা দাবিকে প্রতিষ্ঠার জন্য ৭ এপ্রিল 'দাবী দিবস' ঘোষণা করে। ১২ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এই আদেশনামার সমালোচনা করে ১৩ এপ্রিল 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭ এপ্রিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন যৌথ ঘোষণায় ১৯ এপ্রিলকে 'বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে এবং ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় সাত দফা দাবি জানায়। এই দাবিগুলি মধ্যে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, ২০ টাকা মণ দরে চাল ও ১০ টাকা মণ দরে গম বিতরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো, প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিক অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট বাতিল প্রভৃতি দাবি ছিল।[৩৬] পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও ছাত্র ইউনিয়নগুলি ইয়াহিয়া খানের আইন কাঠামো আদেশের বিরোধিতা করলেও পশ্চিম-পাকিস্তানের ডানপন্থী দলগুলি বিশেষ করে নেযামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ইয়াহিয়া খানের এই আইন কাঠামোকে সমর্থন করেছিল। ইয়াহিয়া খানের আইন কাঠামোর বিরূপ সমালোচনা করলেও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ছাড়া সমস্ত দল আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন পরিবর্তিত হয়ে ৭ ও ৯ ডিসেম্বর চূড়ান্ত হয়। পাকিস্তানের প্রায় এগারোটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সবই ছিল আঞ্চলিক। যেমন আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও পশ্চিম-পাকিস্তানে এই দলের তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে জনপ্রিয় হলেও পূর্ব-পাকিস্তানে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এছাড়া যে-

সমস্ত দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলি হল—ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রভৃতি।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের অন্যতম দাবিদার হয়ে ওঠে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন লাভ করে।[৩৭] আসলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই সাফল্যের পিছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর 'ছয় দফা' দাবির প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস। এই 'ছয় দফা' দাবিকে তাঁরা তাঁদের জীবনমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই নির্বাচনী রায়ের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্যত নস্যাৎ হয়ে যায়। এই বিপুল সাফল্যের পর শেখ মুজিবুর রহমান দাবি করেন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র 'ছয় দফা'কে ভিত্তি করেই রচিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এই দাবি মানতে অস্বীকার করেন। ২০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন—"that no Constitution could be formed nor could any government at the centre be run without his party's co-operation. The PPP, he added, was not present to occupy the opposition Benches in the National Assembly."[৩৮]

এভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের দুই প্রধান আঞ্চলিক দলের অবস্থান বৈপরীত্য রাজনৈতিক সংকট তৈরি করে। আওয়ামী লীগ তাদের 'ছয় দফা'র ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রের সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে অনড় থাকে। অন্যদিকে পিপলস্ পার্টিসহ পশ্চিম-পাকিস্তানের ডানপন্থী দলগুলি কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠনের দাবি জানায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। এই সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার

প্রতিশ্রুতি দেন। তবে 'ছয় দফা' দাবির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি অনড় থাকেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো পৃথকভাবে ঢাকায় এসে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ৯ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বিলম্বিত করার অভিযোগ আনেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর মতামত গ্রহণ না করার জন্য উক্ত অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দেন। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাদের চোদ্দ দফা দাবি উপস্থাপন করে। যা 'ছয় দফা' দাবির বর্ধিত রূপ। ফেব্রুয়ারির শেষ দিন শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে 'ছয় দফা' দাবিকে জোর করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এমনকি 'জয় বাংলা' স্লোগানটি তিনি রাজনৈতিক স্লোগান নয়, স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন বলে জানান। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের এই অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্ত একথা স্পষ্ট করে যে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও কেবল পশ্চিম-পাকিস্তানের এবং সরকারপন্থী দল হওয়ার কারণে তিনি পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির দাবির কাছে মাথা নত করেছিলেন। ইয়াহিয়া খানের এই পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেন। ২ মার্চ পূর্ব-বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ঢাকার পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় তারা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণকে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে 'স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা' মুজিবুর রহমানকে আন্দোলনে

অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। উক্ত সভায় ছাত্রলীগ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার কারণ হিসাবে তিনটি লক্ষ্যের কথা বলে—

> "(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংআদ্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
>
> (২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন কল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিকরাজ কায়েম করতে হবে।
>
> (৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।"[৩৯]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন—"আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে।...রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"[৪০] বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান পূর্ব-পাকিস্তানে গণ-জাগরণ তৈরি করে। ঐদিনই বঙ্গবন্ধু তাঁর দশ দফা দাবির মাধ্যমে পরবর্তী সাত দিন সরকার-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন সকলেই বঙ্গবন্ধুর এই আন্দোলনকে সমর্থন করে নিজ নিজ কর্মসূচি ঘোষণা করে। একদা 'ছয় দফা' দাবির বিরোধী মওলানা ভাসানী ঢাকার পল্টন ময়দানে মুজিবুরের আন্দোলনকে সমর্থন করে চোদ্দ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৪ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীর জনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি দলের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার আহ্বান জানান। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ রাজনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খান একাধিকবার

বৈঠক করেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ২৫ মার্চ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে ২৭ মার্চ বাংলাদেশে হরতাল পালন করা হবে। কিন্তু ঐদিন রাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ঢাকার জনগণের উপর আক্রমণ করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম-পাকিস্তানের কারাগারে আটক করে। ইয়াহিয়া খান ভেবেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হয় উল্টো। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের প্রতিবাদে বাংলাদেশে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ঘোষণাটিতে বলা হয়—"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[৪১] পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণ ২৬ মার্চ থেকে যে পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করেন তা নয় মাস ধরে চলে, যা ইতিহাসের পাতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সামরিকবাহিনী আত্মসমর্পণ করায় মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এই স্বাধীনতালাভ সম্পর্কে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী বলেছেন—"২৭৬ দিনের মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর মানচিত্রে উৎকীর্ণ হল। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হল। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে বাঙালী জাতি জাগ্রত হল।"[৪২] একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। ভারত ছিল বাংলাদেশের প্রধান মিত্ররাষ্ট্র। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের জনমত আদায়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অবদান ছিল অপরিসীম। ভারত সরকারের পাশাপাশি ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে

কলকাতা মুক্তিযুদ্ধে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ এই দুই রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষি জনগণ মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৎকালীন রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকাও ছিল অপরিসীম। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, এমনকি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে এই উদ্যোগ কেবল সরকারিস্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষই বাংলাদেশকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন এই সময়ে। **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বস্তরের শিক্ষক, কর্মী, ছাত্রদের সমাবেশে গঠিত হয় 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'।[৪৩] এই সমিতির কাজ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা এবং বাংলাদেশ থেকে যে-সমস্ত শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা এবং প্রবাসী সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক কাগজ 'জয় বাংলা'। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রের পক্ষ থেকেও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন খবর এই সময় প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতার আকাশবাণী থেকেও বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন খবর প্রচার করা হত। এভাবেই ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের জনগণ ও প্রতিষ্ঠান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল।

২. সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর দৈনন্দিন আচার ব্যবহার, জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থিক অবস্থান সবকিছুর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেই জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব কালচার বা সংস্কৃতি। সংস্কৃতি শব্দটিতে মিশে আছে মানুষের সচেতন ও সম্যক কৃতি। সেই ক্রিয়াকর্ম, আচরণ ও চিন্তনসমূহ বহুদিন ধরে সঞ্চিত হয়ে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলে। অনেক সময় একই দেশ বা জাতির অন্তর্গত হলেও ব্যক্তিমানুষের সামাজিক অবস্থানভেদে, তার রুচির উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের কারণ একাধিক। অনেক সময় ব্যক্তির ধর্মের উপর ভিত্তি করে তার মধ্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির আভাস লক্ষ করা যায়। এজন্য হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের মানুষদের রীতি নীতি অনেকটাই আলাদা। অনেক সময় ব্যক্তির ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সেই অঞ্চল বা দেশের যে-সমস্ত উপাদান ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়। এজন্যই ইংরেজি, ফারসি, বাঙালি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। সাংস্কৃতিক সংকটের এমন নিদর্শন দেখা যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী গঠিত নবরাষ্ট্র 'পাকিস্তান'-এর পূর্ব অংশে। কারণ পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ধর্মের ঐক্য ব্যতীত আর কোনো মিল ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতার কারণে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম থেকেই দেখা দেয় সম্পর্কের সংকট। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ ধর্মে মুসলমান হলেও ভাষায়, পরিধানে, খাদ্যাভ্যাসে সর্বোপরি জীবনযাপনে বাঙালি সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত। অন্যদিকে আরব থেকে আমদানি করা ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি যেহেতু আরবভূমিতে প্রোথিত, তাই আরবি, ফারসি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে তৎপর হলেন। এখানেই পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের শুরু হয় আধিপত্য বিস্তারের সংঘাত। তবে দেশভাগের আগে থেকেই এই সাংস্কৃতিক মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতির এই রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের তরফ থেকে লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান প্রস্তাব) গৃহীত হলে নতুন দেশ গঠনের আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়েন বাংলার মুসলমানরা। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মতাদর্শগত রাজনৈতিক প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা। এর ফলে সে-দিনের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী-সমাজ মানসিকতার দিক থেকে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক মেরুকরণের এই সীমারেখার একপ্রান্তে ছিল নব্যশিক্ষিত উদারপন্থী তরুণ মুসলমান সমাজ, অন্যদিকে ছিলেন ধর্মাশ্রয়ী গোঁড়া মুসলমানরা যাঁদের কাছে মুক্তচিন্তার পরিবর্তে ধর্মচিন্তা প্রধান হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই একাধিক সাংস্কৃতিক-সংগঠন অবিভক্ত বঙ্গে গড়ে উঠেছিল যা সেই সময়ের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রভূমিকে নিজস্ব রীতি-নীতি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও পূর্ব-পাকিস্তানে একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে। একাধিক স্থানে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আরবি ও রোমান হরফে বাংলা লিপি চালু করে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির একটি অংশ। আমরা এই সমস্ত সংগঠন, সম্মেলন ও অপচেষ্টাগুলির ধারাবাহিক কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করব। এই পর্বের সমগ্র বিষয়কে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

২.ক. সাংস্কৃতিক সংগঠন

২.ক.অ. অবিভক্ত বঙ্গের সাংস্কৃতিক সংগঠন (১৯৪০-১৯৪৭)

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি:- লাহোর প্রস্তাবের পর থেকেই বাংলার মুসলমানরা নিজস্ব ভাষাভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে মনোযোগী হন। এই রকম প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'।[৪৪] সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান খাঁ ছাড়াও ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ সাদেকুল রহমান, আবদুল হাই, জহুর হোসেন চৌধুরী, আনোরায় হোসেন, ফজলুল করিম খাঁ ও মশাররফ হোসেন। পরে এই সোসাইটিতে যোগদান করেন আবুল মনসুর আহমদ। সোসাইটির সদস্যরা পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ফলে পাকিস্তানবাদের প্রচারমাধ্যম হিসাবেই এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সোসাইটির মূল নীতিগুলি ছিল—"(১) জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ। (২) পাকিস্তানবাদ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক বক্তৃতা, বিতর্কিকা, বৈঠকী রচনাপাঠ, তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহ, গবেষণা ও আলোচনা, পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি কাজের আয়োজন ও উৎসাহদান। (৩) সাহিত্যিক, সাহিত্যমোদী, মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তানি ভাবধারা সম্প্রসারণ। (৪) জাতীয় তমদ্দুনের উন্মেষক ও সহায়ক আন্দোলনের সাথে academic যোগ সংরক্ষণ। (৫) সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিমূলক আবেদনের রূপায়ণ। (৬) সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ-বিরোধী সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি।"[৪৫] ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে এই সোসাইটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব-বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখার কথা স্বীকার করলেও মুসলমানদের জন্য পৃথক সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন—"পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য।..... তবু এ সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই। শুধু তা নয় মুসলমানদের প্রতিও এ-

সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না।"[৪৬] সভাপতির এই ভাষণ এ-কথাই প্রমাণ করে যে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে সামনে রেখেই ইসলামিক আদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাহিত্য রচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়পর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানরা বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি রক্ষায় পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তাই সোসাইটির গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করার পরিবর্তে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়ে এই সোসাইটির সদস্যরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সচেষ্ট হন।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ:- পাকিস্তান আন্দোলনকে সামনে রেখে কলকাতায় যখন পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়, ঠিক তার এক বছর পরে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়াসেনের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'। এই সংসদের সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। পাক্ষিক 'পাকিস্তান' পত্রিকা ছিল এই সংসদের মুখপত্র। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মিলনায়তনে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। উদ্বোধনী ভাষণে কবি কায়কোবাদ মুসলিম লেখকদের, হিন্দু লেখকদের লিখিত সাহিত্যের অনুকরণ না করে নতুন ধরনের সাহিত্য রচনার আহ্বান জানান। সংসদের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়াসেনের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে তিনি তাঁর ভাষণে সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করলেও পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শকে বজায় রাখতে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে উর্দু শব্দের সুপারিশ করেন। সম্পাদকের ভাষণে সৈয়দ আলী আহসানও পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচনার সুপারিশ করেন। কায়কোবাদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়াসেন, সৈয়দ আলী আহসান তিনজনের বক্তব্যের সারমর্ম হল বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মনীষাকে প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা গুরুত্ব পেলেও বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পাবে ইসলামি চেতনা। এই ধরনের নীতিকে প্রাধান্য দেওয়ায় পরবর্তী সময়ে এই সংসদ পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক বিকাশে দ্রুত প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

২.ক.আ. পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সংগঠন (১৯৪৭-১৯৭১):

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ:- নবরাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ প্রথমেই ভাষা-কেন্দ্রিক সমস্যার সম্মুখীন হন। বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে কিনা এই আশঙ্কায় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিশীল সমাজ তখন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। এমন সময় এই সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।[৪৭] এই সংগঠন মূলত জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছাতেই তাদের কাজ শুরু করেছিল। তবে তাদের মূল দাবি ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা। এই উদ্দেশ্যেই তারা ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?'— এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব সংযোজিত হয়। এটি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিশের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাসেম। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ—

> "১) বাংলা ভাষাই হবে:-
>
> (ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন। (খ) পূর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। (গ) পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।
>
> ২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি- উর্দু ও বাংলা।
>
> ৩) (ক) বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা একশজনই শিক্ষা করবেন। (খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা, যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ হইতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণিতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া যাবে। (গ) ইংরেজী হবে পূর্ব-পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসেবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশি হবে না। ঠিক একই নীতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে ওখানে স্থানীয় ভাষা বা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় স্থান অধিকার করবে।

৪) শাসনকার্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েজ বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।"[৪৮]

২ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করলেও তমদ্দুন মজলিশের নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত গঠনতন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। সংগঠনের মুখপত্র 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই 'সৈনিক' পত্রিকায় তমদ্দুন মজলিশের যে গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয় সেখানে এই মজলিশ গঠনের চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল—"(ক) কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে ব্যাপক তামদ্দুনিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তোলার সহায়তা। (খ) সংগঠন ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে ভেতর দিয়ে নিখুত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা। (গ) আলোচনা ও প্রচারের ভেতর দিয়ে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার সহায়তা। (ঘ) মানবীয় মূল্যবোধের উপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা।"[৪৯] মজলিশের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে কিছু সদস্য শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় মজলিশের সংগঠন কার্যত ভেঙে পড়ে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের পর এই মজলিশের সাংগঠনিক তৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসে।

সংস্কৃতি সংসদ:- ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খান সারওয়ার মুর্শিদের সভাপতিত্বে 'সংস্কৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই সংগঠনের নাম হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ'। এটি মূলত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। তাই কমিউনিস্ট পার্টির মতো এই সংসদেরও লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের অবসান, পুঁজিবাদের পতন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুকূল সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা। শুরুর দিকে সংসদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট হলে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সংসদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সূচনা

হয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়সীমায় এই সংসদ তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', বনফুলের 'কবর', মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গ, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' ও 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে।[৫০] নাটকগুলির বিষয়বস্তু লক্ষ করলে বোঝা যায় নাটকের মতো গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে এই সংসদ সর্বসাধারণের মধ্যে গণচেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করেছিল। নাটক মঞ্চস্থ করা ছাড়াও সংস্কৃতি সংসদ বিভিন্ন সময়ে দেশাত্মবোধক গান ও গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হলে এই সংসদ তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করে। কিন্তু মতাদর্শজনিত কারণে পরবর্তীকালে এই ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে গেলে এই সংসদের কর্মকাণ্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ:- পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্যবাদে বিশ্বাসী কিছু প্রগতিশীল তরুণ যুবকদের প্রচেষ্টায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'।[৫১] সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমদ। পরবর্তীকালে সম্পাদক হন যথাক্রমে আতোয়ার রহমান ও হাসান হাফিজুর রহমান। এই সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক নাসিরউদ্দীন। তাঁরই প্রচেষ্টায় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' অচিরেই একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জয়নুল আবেদিন, বেগম সুফিয়া কামাল, কামরুল হাসান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে ছিলেন।

'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর কর্মসূচি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যসভায় পূর্বজ কবি-সাহিত্যিকদের সমালোচনা করতেন বিশিষ্ট সমালোচকরা। নিয়মিত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কোনো বড়মাপের ব্যক্তিত্ব বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত বিশেষ সভা। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ যে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান পালন করে সেখানে সদস্যদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ করা ছাড়াও বিশেষভাবে পালিত হয় নজরুল ও রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। ম্যাক্সিম গোর্কি ও বার্নাড শ-এর মতো বিদেশি সাহিত্যিকদের সাহিত্য বিষয়েও এই আলোচনা সভাগুলিতে চর্চা চলত। সাহিত্য সংসদের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হাসান

হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় 'একুশে ফেব্রুরায়ী' সংকলনের প্রকাশ। এটি ছিল ভাষা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক স্মারক গ্রন্থ। যে-সময় এই সাহিত্য সংসদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলছিল সেই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে ছিল চূড়ান্ত অরাজকতা। সেই অস্থির সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' যেভাবে নিজেদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছিল তা সত্যই প্রশংসনীয়।

বাংলা একাডেমী:- ভাষা-আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সরকারি বাসভবনে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা একাডেমী'।[৫২] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির লক্ষ্যে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলেও একাডেমির সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে বারবার পাকিস্তানের মৌল ও জাতীয় আদর্শ ফুটে উঠেছে। কারণ সরকারি সাহায্যে পরিচালিত হত বলে জাতীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ এই একাডেমির হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তার বৈচিত্র্য ও পরিকল্পনা অনস্বীকার্য। বাংলা একাডেমী তাদের কর্মসূচিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। ১) প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ২) লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ৩) রচনাবলী প্রকাশ, ৪) সৃষ্টিধর্মী রচনার প্রকাশ, ৫) মৌলিক গবেষণামূলক রচনার প্রকাশ, ৬) জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ, ৭) অনুবাদকর্ম, ৮) গবেষণাবৃত্তি প্রদান, ৯) সাহিত্য পুরষ্কার দান, ১০) সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ইত্যাদি। এইসব কর্মসূচিগুলি বাদ দিয়েও বাংলা একাডেমী প্রতিবছর রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তীর মতো উৎসব পালন করেছে।[৫৩] সবমিলিয়ে বলা যায় সরকারি সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও বাংলা একাডেমী যেভাবে তাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে গেছে তা উল্লেখযোগ্য।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী:- পূর্ব-পাকিস্তানের অগ্রণী নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ঢাকায় স্থাপিত হয় তৎকালীন সময়ের প্রধান ললিতকলা প্রতিষ্ঠান 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী'। নবগঠিত এই ললিতকলা একাডেমীর চেয়ারম্যান ছিলেন ফজলুল হক, সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মাহমুদ নূরুল হুদা। ললিত কলা একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মূলত কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা,

নাট্যকলা, চারু ও কারু শিল্পে শিক্ষাদান ও গবেষণাই ছিল এই ললিত কলা একাডেমী গঠনের উদ্দেশ্য। একাডেমি চেষ্টা করেছিল দেশের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পাঠক্রমের আওতাভুক্ত করে নিয়মিত পাঠদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সংস্কৃতিকে বিশ্বের আঙিনায় তুলে ধরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠলেও নাটক মঞ্চায়নেও এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এই একাডেমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা', 'প্রকৃতির লীলা', 'মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', জসীমউদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ', কাজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করেছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই একাডেমি 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' পালন করে।[৫৪] রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে নারীর নৃত্যকলার মতো ইসলাম অনুশাসন বিরোধী এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়াটাই ছিল 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী'র প্রধান অবদান।

রওনক সাহিত্য সংস্থা:- পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে তমদ্দুন (কৃষ্টি বা সংস্কৃতি) গঠনের জন্য সব ধরনের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে একুশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় 'রওনক সাহিত্য সংস্থা'। ইব্রাহিম খাঁ ও গোলাম মোস্তফা এই সংস্থার সহ-সভাপতি এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সংস্থার কর্মসূচি সাংগঠনিক সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিমাসে এক-এক জন সদস্যের বাসায় একটি বৈঠক হত। সেখানে একটি প্রবন্ধ পঠিত হত এবং সেই প্রবন্ধের উপর আলোচনা হত। তবে এই ধরনের আলোচনাসভাগুলির মধ্যে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাই বেশি হত।

আলোচনা সভা ছাড়াও এই সাহিত্য-সংস্থা বেশ কিছু সমালোচনা ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। মীর আবুল হোসেনের সংকলিত 'নজরুল সাহিত্য' ছাড়াও মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর 'জুলেখার মন', আবদুস সাত্তারের 'বৃষ্টিমুখর', আবদুল হাই মাশরেকীর 'কুলসুম' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৫৫] তবে এই সংস্থার কার্যক্রম বেশি দিন ধরে চালানো সম্ভব হয়নি। তার কারণ অবশ্যই সংস্থার সাংগঠনিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা। কোনো আলোচনা সভা তখনই সার্থক ও সর্বজনগৃহীত হয় যখন তা আরো বেশি করে সর্বজনের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু এই সংস্থার কার্যক্রম একুশ জন সদস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানপন্থী ও মুসলিম রক্ষণশীলতার কারণে

শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম এই সংস্থার প্রতি কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করায় পরবর্তী কালে এই সংস্থা দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান লেখক সংঘ:- পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাসচিব তথা বিশিষ্ট উর্দু-ছোটগল্পকার কুদরতুল্লাহ শাহাব এবং কয়েকজন উর্দু লেখকদের উদ্যোগে পাকিস্তানের জনজীবনকে অধিকতর সৃজনশীল ও উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি করাচির গোয়ানিজ হলে তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনদিনের সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই ‘পাকিস্তান লেখক সংঘ’ (Pakistan Writer’s Guild) গঠিত হয়। করাচির এই লেখক সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘পাকিস্তান লেখক সম্মেলন’ (Pakistan Writer’s Convention)। পাকিস্তানের প্রায় দুই শতাধিক লেখক এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ড. কাজী মোতাহার হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল হাই, আবদুল কাদির, আজহারুল ইসলামসহ প্রায় পঞ্চাশ জন লেখক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে লেখকদের নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয় যেখানে গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহসহ পূর্ব-পাকিস্তানের এগারো জন লেখক স্থান পান। সম্মেলনের শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মিসেস মোহাম্মদ হোসেন। এই দিনে পঁচিশ জনের একটি কমিটি গঠিত হয় যেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের এগারো জন নির্বাচিত হন। দিনের শেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান যোগদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে লেখকদের উদ্যম ও পাকিস্তানের সংহতিসাধনের প্রয়াসের জন্য তাঁদের প্রশংসা করেন এবং ইসলামি আদর্শকে সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার সুপারিশ করেন। কুদরতুল্লাহ শাহাব তাঁর ভাষণে লেখকদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলেন যে, লেখক কখনই অন্যদেশের সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবেন না। এমনকি কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। তাঁর মতে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য পাকিস্তানের লেখকদের চিন্তা-ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে বিপথগামী করে তুলেছে।[৫৬]

তবে এই সংঘে পূর্ব-পাকিস্তানের লেখকরদের আমন্ত্রণ ও যোগদান থাকলেও সংঘের কর্মসূচিতে কোনো প্রাদেশিক ভাষা বা সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়নি বরং কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। আসলে আরবি, ফারসি, উর্দু সম্বলিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনুকূল সাম্প্রদায়িক সাহিত্যচর্চার একটি ধারা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানকে ইসলাম-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশ হিসাবে এই সংঘকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের সংঘাত দিন দিন তীব্রতর হয়ে ওঠায় কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের লেখকরা এই সংঘের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে নতুন সংগঠন স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ছায়ানট:- ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপনের পর পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী নিজেদের বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'ছায়ানট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর কর্ণধার ছিলেন ওয়াহিদুল হক এবং তাঁর স্ত্রী সনজীদা খাতুন। এঁরা যেহেতু উভয়েই সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানে বিষয় হিসাবে সঙ্গীতই প্রাধান্য পেয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মিসেস ফরিদা হাসান। সঙ্গীতপ্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছায়ানট দেশের অতীত সঙ্গীত ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ঢাকার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরানো গানের উপর এই প্রতিষ্টান একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করেছিল। পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যালয়'।[৫৭] ঢাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলে এই প্রতিষ্ঠান। 'শ্রোতাদের আসর' নামে এরা বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব নামে এই প্রতিষ্ঠান বছরে চারটি অনুষ্ঠান করত। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকেই কিছু কর্মী রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি প্রচার করেন। জনপ্রিয়তার জন্য গানটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উন্মাদনাই 'ছায়ানটে'র সরকারি রোষে পড়ার অন্যতম কারণ। যে-সময় সরকারি তৎপরতায় পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধপ্রায় সেই সময়ে দাঁড়িয়ে শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে 'ছায়ানট' রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে

বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করেছিল। 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যক্রম কেবল সঙ্গীতচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ দাঙ্গার প্রতিবাদে 'ছায়ানট' শান্তিমিছিল বের করে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হলে 'ছায়ানটে'র কর্মীরা তহবিল সংগ্রহ করে বিপন্ন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৫৮] 'ছায়ানটে'র ধারাবাহিক কর্মসূচি লক্ষ করলে দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির প্রতিবাদ বা প্রয়োজনস্বরূপ গড়ে ওঠেনি। এর পিছনে ছিল একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে উদ্যোগী হয়েছিল। এ-কারণেই সঙ্গীতশিক্ষার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্কৃতি জগতে 'ছায়ানট' উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা:- পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাত তীব্র হয়ে উঠলে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে আসে। এই রকম অবস্থায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান লেখক সংঘের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রবীণদের বদলে নবীন সাহিত্যিকরা নির্বাচিত হন। তাঁরাই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে পূর্বাঞ্চল শাখার কাজ শুরু করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে এই শাখার প্রথম প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'লেখক সংঘ' পত্রিকা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় 'পরিক্রম' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই পূর্বাঞ্চল শাখার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।[৫৯] ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় এই শাখা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্বাঞ্চল শাখা দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। প্রথমটি ছিল মহাকবি স্মরণোৎসব এবং দ্বিতীয়টি আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত 'মহাকবি স্মরণোৎসব' উৎসবে উপমহাদেশের বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের পাঁচজন বিখ্যাত কবি মীর্জা গালিব কাজী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আল্লামা ইকবাল, ও কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান হয়। পাঁচদিনের এই কবি-কেন্দ্রিক উৎসব পূর্ব-পাকিস্তানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ রবীন্দ্রনাথ-উৎসবকে ভালো চোখে নেননি। তাই 'রবীন্দ্র-দিবসে'র পরের দিন 'দৈনিক পয়গাম'

পত্রিকায় 'সীমাহীন ধৃষ্টতা' প্রবন্ধে আবুল হাশিমকে আক্রমণ করে সমালোচনা করা হয়। এতে বলা হয়—''পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রপ্রশ্নের কবর বা শশ্মান রচিত হইয়া গিয়াছে।''[৬০] এই পত্রিকা অভিযোগ করে যে রবীন্দ্র-দিবসের মাধ্যমে কার্যত জোর করে পূর্ব-পাকিস্তানে 'রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠা' দিবস পালিত হয়েছে। তাই 'তৌহিদবাদী পূর্ব পাকিস্তানীদের' উপর এই সাংস্কৃতিক হামলার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে রুখে দাঁড়ানো উচিত। তবে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ও ২১ অক্টোবর ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে শুর হয় পূর্বাঞ্চল শাখার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান'। এশিয়া ও আফ্রিকা উভয় মহাদেশ যেহেতু দীর্ঘকাল সাম্রাজাবাদী শক্তির শাসনে নিপীড়িত তাই এই দুই মহাদেশের লেখকদের সাহিত্যেও ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও নিপীড়িত জাতির শোষণমুক্তির কামনা করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছিল দুইদিনের এই অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে হোচিমিন, মাও সে তুং, নাজিম হিকমতের অনূদিত কবিতাও পাঠ করা হয়। 'অপরাজেয় ভিয়েতনাম' নামক গণসঙ্গীত পরিবেশন করেছিল খুলনার 'সন্দীপন' সঙ্গীত গোষ্ঠী। মঞ্চস্থ হয় চিনা অপেরা 'White-haired Girl'-এর বাংলা অনুবাদ 'শ্বেত-কেশিনী'।[৬১] ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দেও পূর্বাঞ্চল শাখা তিনটি অনুষ্ঠান করেছিল।

কর্মসূচি লক্ষ করলেই বোঝা যায় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ'-এর সঙ্গে 'পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা'-এর ভাবনাগত ব্যবধান অনেকটাই। পাকিস্তান লেখক সংঘ যেভাবে সংকীর্ণ ধর্মীয় ভাবনায় আবদ্ধ থেকে ইসলামিক আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটাতে চেয়েছিল, কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিল, সেখানে পূর্বাঞ্চল শাখা বিতর্কিত রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে পৃথক উৎসবের আয়োজন করেছে। কেবল রবীন্দ্রনাথ নয় নজরুল ও মধুসূদন দত্তকেও তারা অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমনকি যে বিদেশি সাহিত্যের প্রতি পাকিস্তানি সাহিত্যিকদের অনুরাগী হওয়া উচিত নয় বলে বিধান দিয়েছিলেন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী কুদরতুল্লাহ শাহাব, সেখানে দাঁড়িয়ে দুটি মহাদেশের সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে পূর্বাঞ্চল শাখা 'পাকিস্তান লেখক সংঘ'-এর একটি অংশ হলেও ধর্মীয় সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে মুক্তচিন্তা ও সাহিত্যভাবনায় যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে তার ফলেই পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক

বিকাশ অনেকাংশে সুস্থ পথে এগিয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পর্ক যখন চরমে ওঠে তখন পূর্বাঞ্চল শাখার সদস্যরা পৃথকভাবে অগ্রসর হয়েছে এমনকি স্বাধিকার আন্দোলনেও যোগ দিয়েছে। সাংস্কৃতিক পথযাত্রার পাশাপাশি জনগণের দাবি আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ঘটনায় বোঝা যায় এই সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তানের সার্বিক জনজীবনের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

নজরুল একাডেমী:- অবিভক্ত বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদান, নজরুল বিষয়ে চর্চা, গবেষণার জন্য ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মে আবুল কালাম শামসুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন কবি তালিম হোসেন। প্রথমপর্বে এই একাডেমীর সদস্য হয়েছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন, জাহানারা আরজু, আনসার আলী, আবদুর রহমান, আবদুল হাই প্রমুখ। গঠনতন্ত্রে একাডেমীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

> ''এই একাডেমী হবে পাকিস্তানী জাতীয় ভাবধারায় পুষ্ট একটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-কেন্দ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রচেষ্টা হবে:
>
> (ক) মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাবমূর্তি এবং আদর্শকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত ও জাগরুক রাখা।
>
> (খ) পাকিস্তানের মন-মানসে ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এদেশের স্বকীয় চারিত্র্য ও ধ্যান-ধারণার সংগে সংগতিপূর্ণ আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে সম্পৃক্ত ও সুসমন্বিত করা।
>
> (গ) মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির নিমার্ণ ও সংরক্ষণ।''[৬২]

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই একাডেমি 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই একাডেমির এগারোটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি স্বতন্ত্র ঝোঁক থাকায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই এই একাডেমির কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে আসে। প্রায় পাঁচ বছরের কার্যসীমায় এই একাডেমি নজরুল গবেষণার মূল্যবান দলিল, নজরুলের সঙ্গীতগুলিকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, যা পরবর্তীকালে নজরুল-চর্চার মূল্যবান দলিল হয়ে ওঠে। এটাই ছিল 'নজরুল একাডেমী'র সবচেয়ে বড়ো অবদান।

২.খ. সাংস্কৃতিক সম্মেলন

এ-পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সংগঠন ব্যতিরেকেও পূর্ব-পাকিস্তানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক চালচিত্রে সেগুলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। **১৯৪৮** থেকে **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ সাতটি সাহিত্য-সম্মেলন, একটি শিক্ষা-সম্মেলন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাহিত্য-সম্মেলনগুলি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেসরকারি উদ্যোগে এবং সেগুলোতে পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিজস্ব মতাদর্শের ভিত্তিতে সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করেছিলেন। সবমিলিয়ে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে এই সময়পর্বের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়। আমরা পর্যায়ক্রমে এইসব সাংস্কৃতিক-সম্মেলনগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করবো।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা:- পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহারের নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের জন্য যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় তাতে হবিবুল্লাহ বাহার সভাপতি এবং অজিত গুহ ও সৈয়দ আলী আশরাফ যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। দৈনিক 'আজাদ' অফিসে অভ্যর্থনা কমিটির আলোচনা সভাগুলি অনুষ্ঠিত হত। **১৯৪৮** খ্রিস্টাব্দের **৫** ডিসেম্বর অভ্যর্থনা কমিটির প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে **১৯৪৮** খ্রিস্টাব্দের **৩১** ডিসেম্বর এবং **১৯৪৯** খ্রিস্টাব্দের **১** জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করে কবিতা, শিশু-সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুথিসাহিত্য, লোকসাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাহিত্য সম্মেলন চলাকালীন ঢাকার প্রগতিশীল লেখক সংঘ এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আসন্ন সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রগতি সাহিত্য বিরোধী এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাই এই সম্মেলনে প্রগতি লেখক সংঘের কোনো সদস্য অংশ গ্রহণ করবে না। এই সিদ্ধান্তে সব থেকে বেশি বিপাকে পড়েছিলেন সম্মেলনের সম্পাদক অজিত গুহ। কারণ তিনি লেখক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও

তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর কার্জন হলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয়। গোলাম মোস্তফা নবজাগ্রত রাষ্ট্রের নতুন আদর্শ, আগামী দিনে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এবং সাহিত্যিকদের কর্তব্য বিষয়ে ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে ড. শহীদুল্লাহ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা বলেন। তিনি বানান সংস্কারের পক্ষে মত দিতে গিয়ে বানান সংস্কার কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার উপরেও জোর দেন। এরপর তিনি বলেন—''আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতিনিজের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মা লা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।''[৬৩] তাঁর এই বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে একটি কার্যকরী সংসদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু আবুল কাসেম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন কারণ ঢাকার অনেক প্রগতিবাদী তরুণ লেখক এবং ঢাকার বাইরের অনেক নামকরা লেখক এই কমিটিতে স্থান পাননি। শেষ পর্যন্ত আবুল কাসেমের দাবি মেনে কমিটি সংশোধন করা হয় এবং বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আসলে সরকারি অর্থানুকূল্যে আয়োজিত হওয়ায় এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় ছিল না। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঢাকায় এসে উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্ক থামানোর কৌশল হিসেবেই এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। এসবের পরেও বলা যায় ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান তৈরির পর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ যে সচেতন ছিল তার প্রমাণ এই সম্মেলন। এই সম্মেলনই পরবর্তীকালের বিভিন্ন সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পথ-প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল।

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন:- ইংরেজ শাসনে সমগ্র ভারতবর্ষে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল সেখানে সমাজের শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তাছাড়া মুসলমান সমাজ ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে ইংরেজি শিক্ষায় অনীহা দেখালে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। এই রকম অবস্থায় নবরাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর প্রথম দিকে সেখানে কোনো পরিকল্পিত

শিক্ষা-কাঠামো ছিল না। ফলে শুরু থেকেই পাকিস্তান বিশেষত এর পূর্ব অংশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যয়ের সম্মুখে পড়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অগাস্ট ঢাকায় একটি ছাত্র-কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন' আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত সমাজের প্রগতিশীল অংশের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় আড়াই'শো জন ছাত্র প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল। অধিবেশনের শুরুতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অলি আহাদ পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ফজলুল হক হল মিলনায়তনে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রতিটি জেলার ছাত্র প্রতিনিধিরা পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের রিপোর্ট পেশ করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার দুর্দশার জন্য পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়। সমালোচনা করা হয় পাকিস্তান সরকারের সংকোচ-নীতিরও। ঐদিন সম্মেলনের ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি 'গণশিক্ষা পরিষদ' গঠন করা হয়। অধিবেশনের শেষে সর্বসম্মতিক্রমে একটি মূল প্রস্তাব ও ১৬ দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল—পুলিশ, মন্ত্রি, উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের খরচ কমিয়ে শিক্ষা খাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রকৃত চাষিদের মধ্যে সমভাবে জমি বন্টন করা এবং লাভের অতিরিক্ত অংশ শিক্ষার খাতে ব্যয় করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বেতন কমানো ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাইমারি স্কুল পুনরায় চালু করা ইত্যাদি।[৬৪]

এই দাবিগুলি ছাত্রদের হলেও এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের কয়েকটি দিক ফুটে ওঠে। ছাত্ররা কেবল নিজেদের শিক্ষা-সম্পকির্ত দাবি দাওয়া নয় সমাজের অন্যান্য সমস্যার প্রতিও আলোকপাত করেছিল। নামে 'শিক্ষা সম্মেলন' হলেও শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা ছাড়াও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পুলিশ, মন্ত্রীদের বেতন কমানো, চাষিদের জমি বিলি, শিশুশ্রম রোধ প্রভৃতি দাবির মধ্যে দিয়ে এই সম্মেলন কার্যত এক নতুন সামাজিক,

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছিল যা পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্দোলনগুলির ভিত্তিভূমি হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম:- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রামের প্রগতিশীল কর্মীরা 'সংস্কৃতি পরিষদ' এবং 'প্রান্তিক' নামে দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দের **১৬** এবং **১৭** মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে'র আয়োজন করা হয়। 'মর্নিং নিউজ' এবং 'আজাদ' পত্রিকা এই সম্মেলনকে কমিউনিস্টদের সম্মেলন বলে প্রচার শুরু করে। কারণ সম্মেলনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অনেকেই মার্ক্সীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এই অপপ্রচারের ফলে ঢাকার অনেক সাহিত্যিক এই সম্মেলন বয়কট করেন। কলকাতা থেকে যোগদান করেন 'সাহিত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। শেষপর্যন্ত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে সভাপতি এবং বেগম সুফিয়া কামালকে প্রদান অতিথি নির্বাচন করে সম্মেলন শুরু হয়।[৬৫] সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম বিশারদ প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দেশ-কালের উর্ধ্বে উঠে মানব-কল্যাণের জন্য নিবেদিত হতে বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে বেগম সুফিয়া কামাল বিদেশি সাহিত্যের অনুকরণের বিরোধিতা করে দেশীয় কৃষ্টিকে অবলম্বন করে মৌলিক সৃষ্টির উপর জোর দেন। ড. কাজী মোতাহার হোসেন 'কাব্যে সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যবোধ' প্রবন্ধে সাহিত্যিকদের দেশীয় ঐতিহ্য-সচেতন হয়ে সাহিত্য রচনা করার আহ্বান জানান। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান 'মাতৃভাষার মর্যাদা' প্রবন্ধে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার উপর জোর দেওয়া হয়। ধর্মগত বিভেদের উর্ধ্বে উঠে এই সম্মেলন যেভাবে মানব কল্যাণ ও দেশীয় সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছিল তা স্মরণীয়।

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কুমিল্লা:- কুমিল্লা প্রগতি মজলিশের উদ্যোগে **১৯৫২** খ্রিস্টাব্দের ২২, ২৩ ও ২৪ অগাস্ট কুমিল্লা শহরে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' শুরু হয়। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক অজিত নাথ নন্দী এবং অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সম্মেলনে ফরওয়ার্ড

ব্লক, যুবলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেভোলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এটি ছিল সরকার-বিরোধী সম্মেলন।

এই সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা ও প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক' শিল্পী সংঘ, রেলওয়ে শিল্পী সংঘ, ঢাকার আর্ট স্কুল, পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ, অগ্রণী শিল্পী সংঘ প্রভৃতি সংগঠন। এছাড়া Urdu progressive Writer's Association-এর পক্ষে সালাহউদ্দীন আহমদ, দিনাজপুর থেকে শরদিন্দু ব্যানার্জী, রাজশাহী থেকে শচীন্দ্র প্রসাদ মজুমদার, সিলেট থেকে নূরুল রহমানের নেতৃত্বে একটি ছোট দলও এই সম্মেলনে যোগদান করে।[৬৬] ২২ অগাস্ট আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের সূচনা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অজিত নাথ নন্দী তাঁর ভাষণে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্বিন্যাসের উপর জোর দেন। তিনি বলেন দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার কারণে আমাদের মধ্যে অনুগ্রহ ও অনুকরণের 'ভদ্র' সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতিকে ত্যাগ করা সম্ভব নয় কিন্তু সমাজের উন্নতিতে এই সংস্কৃতির কোনো অবদান নেই। আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে লোকসংস্কৃতির যে নিরন্তর প্রবাহ বয়ে চলেছে তার মধ্যেই এ-দেশের সংস্কৃতির মূল বীজ নিহিত আছে। তাই তিনি বিদেশি সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ের উপর জোর দেন। সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ও ইউরোপীয় ধারার তুলনা করতে গিয়ে বলেন—পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মনে ইসলাম-প্রীতি যতটা আছে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ততটা নেই। অন্যদিকে দেশের তরুণ সমাজ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরাগী। ফলে ভবিষ্যতে তিনি এই দুই ধারার আদর্শগত সংঘাতের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গেও তিনি সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন। ২৩ অগাস্ট সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাহবুব-উল-আলম। তিনিও দেশের দুই বিপরীতমুখী সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিগুলোর সংঘাত ও তার ফলে নতুন আদর্শ নির্মাণের আশা প্রকাশ করেন। এই অধিবেশনে 'তন্ত্রসংকট' প্রবন্ধ পাঠ করেন আহমদ শরীফ। তিনি বলেন দেশের তরুণ সমাজ আদর্শগত সংকটের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত। ২৪ অগাস্ট সম্মেলনের তৃতীয় তথা শেষ দিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালার শিক্ষক অবনীমোহন চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে প্রগতিশীল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে মুক্ত কণ্ঠে গ্রহণ

করার আবেদন জানান। এর ফলেই বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হবে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিন দিনের এই সম্মেলনে প্রবন্ধ, আলোচনা, কবিতা পাঠ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। নজরুলসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মঞ্চস্থ হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক। এছাড়া ঢাকা আর্ট স্কুল এই সম্মেলনে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।[৬৭] সম্মলনে গৃহীত প্রস্তাবে দেশের সংস্কৃতি তথা ভাষা-আন্দোলনকে দমন করার সরকারি প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয় এবং যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির উপর জোর দেওয়া হয়। এই সম্মেলন কেবল দেশীয় সংস্কৃতি নয় একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপরেও জোর দিয়েছিল।

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা:- পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ঢাকার কার্জন হলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন' করা হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল—''আমরা যদি পাকিস্তানকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তুলতে চাই তবে প্রথমে, 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ' সম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার ধারণা করে নেবো। আমরা আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে নিতে চাই। ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানবকল্যাণকর আদর্শ তা আমরা কোনো গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে এবং অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিতে চাই।''[৬৮] এই সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ, সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল গফুর। সমাজবিজ্ঞান, ইসলামি আন্দোলন, লোক-সংস্কৃতি, সাহিত্য-অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান এই পাঁচ ভাগে সম্মেলনের কার্যাবলী বিভক্ত ছিল। ১৭ অক্টোবর ড. কাজী মোতাহার হোসেন-এর সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের মূল অধিবেশন শুরু হয়। প্রবন্ধ পাঠ ছাড়াও এই সম্মেলনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে আব্বাসউদ্দীন আহমদ এবং সলিল চৌধুরী গান পরিবেশন করেছিলেন। এই সম্মেলনে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সংযোগ গড়ে তোলার জন্য 'ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্স' নামে সংগঠন তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলন পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক বিকাশে জাতীয় আদর্শকেই অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিল। সম্মেলনের অনুষ্ঠান একাধিক শাখায় বিভক্ত থাকলেও প্রতিটি শাখায় সংশ্লিষ্ট

বিষয়ের তুলনায় গুরুত্ব পেয়েছিল রাষ্ট্রীয় আদর্শ। বিশেষত সাহিত্য শাখায় সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিকে প্রাধান্য না দিয়ে জাতীয় আদর্শের অনুকূল সাহিত্য রচনা করার সুপারিশ করা হয়েছিল। আসলে এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে। তাই তাদের ভাবধারাকেই আয়োজকরা এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা:- ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ার জন্য বিরোধী দলগুলি একত্রে ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করেছিল। এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতিমনস্ক কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজনে উদ্যোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তনের পর **১৯৫৪** খ্রিস্টাব্দের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল ঢাকায় ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বেই পূর্ব-পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল।[৬৯] ২৩ এপ্রিল ঢাকার কার্জন হলে ড. আবদুর গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। **১৯৪৮** খ্রিস্টাব্দের সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা আগে বাঙালি পরে মুসলমান এই কথা বলে তিনি প্রবল সমালোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু **১৯৫৪** খ্রিস্টাব্দে ভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি সেদিনের বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেছিলেন—“১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল।.... এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় **১৯৪৮** সালের পরে আর কোনও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভব হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাঙ্গালার গভর্নমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি।”[৭০] ২৪ তারিখে লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন রমেশ শীল ও বন্দে আলী মিঞা। অনুষ্ঠানে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের

অভিভাষণে সমসাময়িক পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়। ২৫ এপ্রিল সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করায় বাধা দেওয়ার জন্য পাকিস্তানপন্থীদের সমালোচনা করা হয়। ড. কুদরত-ই-খুদা তাঁর ভাষণে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুপারিশ করেন। ঐদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল গীতি ছাড়াও 'নবজীবনের গান' পরিবেশন করেছিল চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' নাটকের ছায়ানাট্য পরিবেশন করেছিল চট্টগ্রামের লোক সংস্কৃতি পরিষদ। ২৬ এপ্রিল সম্মেলনের চতুর্থ দিনে 'আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা' শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি কালচারকে জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে অভিহিত করেন। ২৭ এপ্রিল সম্মেলনের শেষ দিনে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের মনোজ বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যোগদান করেছিলেন।[৭১] পূর্বের সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগের শাসনকালে। ফলে সম্মেলনের বিষয় বা বক্তা তালিকায় পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যিকদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এই প্রথম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবাদর্শবিরোধী এ. কে. ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল। তিনি বরাবর অখণ্ড বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সরকারের উদ্যোগেই সম্মেলনটি আয়োজিত হয়েছিল। ফলে এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকরা যেমন গুরুত্ব পেয়েছেন তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানের পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যিকরা উপেক্ষিত হয়েছেন।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, টাঙ্গাইল:- ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন বসে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। এই অধিবেশন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সমগ্র কর্মসূচি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে ছিল কাউন্সিল অধিবেশন-৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি, অন্যভাগে ছিল সাংস্কৃতিক সম্মেলন-৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি।

৮ ফেব্রুয়ারি ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন শুরু হয়েছিল। এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। স্বাগত ভাষণে আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বলেন যে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সু-সম্পর্ক গড়ে তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে পাকিস্তান তৈরির পর চার কোটি মুসলমান ভারতে রয়ে গেছে অন্যদিকে এক কোটি হিন্দু পাকিস্তানে রয়েছে। পাকিস্তানকে তিনি সব ধর্মের দেশ বলার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। ৯ ফেব্রুয়ারি সম্মলনের দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য আলোচনায় দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ড. কুদরত-ই-খুদা, ড. ওসমান গণি, ড. শামসুদ্দীন আহমদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখ নেতৃবর্গ যোগদান করেছিলেন।[৭২] ১০ তারিখ সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃভাষা রক্ষায় আত্মত্যাগের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণদের অভিনন্দন জানান। প্রবোধকুমার সান্যাল এই সম্মেলনকে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলন বলে উল্লেখ করেন।[৭৩] পাকিস্তানের সমসাময়িক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কাগমারি সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন ছিল পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীলদের প্রতিবাদস্বরূপ। সম্মেলনে কেবল বাংলা সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বরং দুই বাংলার সাহিত্যিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটানোর কথা বলা হয়েছিল। এই সম্মেলন পাকিস্তানি তমদ্দুনের (কৃষ্টি বা সংস্কৃতি) সমর্থকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা যায় সাহিত্য আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের যে প্রয়াস কাগমারী সম্মেলনের কর্মীরা করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, ঢাকা:- ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ভারতের মুসলমানদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত মুসলমানদের এই অবস্থার উন্নতি হয়নি। বরং এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্যই পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ কয়েক দিনের জন্য মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করেছিল। যদি এই বিদ্রোহ সফল হত তবে বাহাদুর শাহ

পুনরায় ভারত সম্রাট হতেন। তাই এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ, ইসলামী সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি গোষ্ঠী একযোগে সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭) শতবার্ষিকী পালনের জন্য ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯, ৩০ ও ৩১ মার্চ ঢাকার কার্জন হলে এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ২৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে মৃত্যুবরণ করা ভারতীয় মুসলিম সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।[৭৪]

তিনদিনের এই সম্মেলনের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন ভাষণে শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক মাহফুজুল হক সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী পালনের মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান।[৭৫] এই বছরেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রগতিশীল কর্মীদের দ্বারা কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ধর্মীয় গৌরবের তুলনায় বড়ো হয়ে উঠেছিল ভাষা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। সেখানে জাতীয় আদর্শের অনুকূল পাক-বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের কার্যত উপেক্ষাই করা হয়েছিল। এই রকম প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানপন্থীদের শতবর্ষের পুরানো ঘটনার মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় গৌরবের কথা স্মরণ করানোর প্রচেষ্টা কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রতিবাদস্বরূপ কর্মকাণ্ড বলেই মনে হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, চট্টগ্রাম:- পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য মহফিলের উদ্যোগে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২, ৩, ৪ ও ৫ মে চট্টগ্রামে ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে’র আয়োজন করা হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন আবদুর রহমান এবং নূরুল ইসলাম চৌধুরী। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী রফিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী এই অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুর রহমান বলেছিলেন—“যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ইতিপূর্বে যে ইসলামিক আদর্শ রূপায়ণের প্রস্তুতি চলছিল তা বাধাগ্রস্ত হল। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তানায়কদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ছদ্ম আবরণে বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক

একীকরণের অভিশপ্ত প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ক্রমশ পাকিস্তানী আদর্শকে ম্লান ও দুর্বল করতে লাগল।....এর প্রতিবাদে আমরা জনকয়েক মিলে স্থানীয় কর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের জন্মভূমি ইসলামাবাদে বা চাটগাঁয়ে পাকিস্তানী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত দেশহিতৈষীদের কি করা কর্তব্য, যা সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিন দিনব্যাপী এক সাহিত্য মাহফিলের আয়োজন করি।"[৭৬] এই সম্মেলনে ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছিল।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর মধ্যে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি সমিতির সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। আসাদুল ইসলাম চৌধুরী এবং মুহম্মদ মুজাদ্দেদ সমিতির যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল—"বাংলা ভাষা ও লিপির উদ্ভব ও বিকাশ, বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন এবং বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। বহু চিত্র ও পোস্টারের দ্বারা এবং একটি পুস্তক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ভাষা, সাহিত্য ও মুদ্রণের ক্রমবিকাশকে সহজবোধ্য করে তোলা হয়।"[৭৭]

২২ সেপ্টেম্বরের আলোচনার বিষয় ছিল কাব্য। প্রাচীন যুগে রচিত চর্যাপদ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কবিতার ধারা পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নবীবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতা যেমন পাঠ করা হয় তেমনি সৈয়দ আলাওল, সৈয়দ হামজা, নজরুলের মতো মুসলমান কবিদের কবিতাও পাঠ করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ২৪ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের তৃতীয় দিনে গদ্য

বিষয়ক আলোচনায় উইলিয়াম কেরী থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত গদ্যের ধারাবাহিকতা বিষয়ে আলোচনা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের চতুর্থ দিনে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন এনামুল হক। ২৬ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের পঞ্চম দিনে নাটক পাঠের আসরে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকের অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের ষষ্ঠ দিনে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা করেন সৈয়দ আলী আহসান। ২৮ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের শেষ দিনে 'হাজার বছরের বাংলা গান' অনুষ্ঠানে শিল্পীরা একক ও সমবেত কণ্ঠে কাহ্নপাদ থেকে জসীমউদ্দীন পর্যন্ত বিভিন্ন কবি ও গীতিকারের সঙ্গীত পরিবেশন করেন।[৭৮] সাহিত্য বিষয়ক প্রদর্শনী চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল—ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। চিত্রের মাধ্যমে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে বাংলা ভাষার আবির্ভাব ঘটেছে তা দেখানো হয়েছিল। এই 'ভাষা ও সাহিত্য সভা' তৎকালীন সময়ে বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। ঢাকার প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র এই সাহিত্য-সম্মেলনের প্রশংসা করে সম্পাদকীয় ও আলোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রায় সমস্ত সম্মেলন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। কোনো ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ যেমন বড়ো হয়ে উঠেছিল তেমনি অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত সাহিত্য-সম্মেলন সরকার-বিরোধী বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। এই রকম পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ সাহিত্য-কেন্দ্রিক ছিল। সাত দিনের এই সাহিত্য-কেন্দ্রিক আলোচনা এটাই প্রমাণ করে যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব থাকলেও পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণ দেশ-কাল-রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠেই সাহিত্যকে গ্রহণ করেছে। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যও এই সম্মেলনে সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

এই সমস্ত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলনের কর্মসূচি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-বাংলার মানুষ পাকিস্তানরাষ্ট্র গঠনের পক্ষেই মত দিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন নতুন দেশ গঠনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতিসত্তার বিকাশ অধিকতর সহজ হবে। কিন্তু তাঁদের এই ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের দাবি দাওয়া নির্বিচারে মেনে

নেবে না বরং নিজস্ব মতাদর্শকে জোর করে এই প্রদেশের জনগণের উপর প্রয়োগ করবে তার আভাস ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরই পাওয়া যায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আরবি হরফে বাংলা চালুর প্রচেষ্টা থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের উপর শুরু হয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ। এরপর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলন, পাকিস্তান সরকারের ফ্যাসিবাদ নীতির পাশাপাশি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের অদম্য মানসিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই সময় থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারবাহিকভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র ও তার বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রতিবাদের দলিল হিসাবে এই সময়পর্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

২.গ. সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র

নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর যে সমস্ত আক্রমণ এসেছিল তার মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত আক্রমণ ছিল অন্যতম। বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইসলামীয় সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ প্রচার করার পাশাপাশি বাঙালির ভাষা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার বাংলা বর্ণমালা তুলে দিয়ে ভাষা-সংস্কার ও জাতীয় ভাষাসৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিল, একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের যে প্রতিরোধ আন্দোলন তা এই সময়ের সাংস্কৃতিক দলিল হিসাবে বিবেচ্য। আমরা এই দুটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই সময়ের সাংস্কৃতিক বিবর্তনটিকে দেখার চেষ্টা করবো।

২.গ.অ. বাংলা ভাষার সংস্কার ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস

১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে সরকারি পযার্য়ে বাংলা ভাষার উপর প্রধানত তিন দিক থেকে আক্রমণ আসে। প্রথমত, বাংলা ভাষার মধ্যে উর্দু, আরবি শব্দের প্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামিক রূপ ফুটিয়ে তোলা; দ্বিতীয়ত, আরবি ও রোমান হরফে বাংলা লেখা; তৃতীয়ত, বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জীবন থেকে মুছে দেওয়া এবং পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করা। এছাড়াও ছিল বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করা। পূর্ব-বাংলা ভাষা কমিটি, বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার সংস্কার সাধনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যেমন রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তেমনি ভাষা-সংস্কারের আড়ালে বাংলা ভাষা ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এ-সম্পর্কে বশীর আল্‌হেলাল বলেছেন—''পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলনের প্রায় সকল স্তরে এই ভাষা-সংস্কার-প্রয়াসের ব্যাপারটি উঠে এসেছে। ভাষা-সংস্কারের তিনটি প্রধান দিক ছিল: লিপি-সংস্কার, বানান-সংস্কার ও ভাষা-সংস্কার।''[৭৯] এই পর্যায়ের আলোচনা তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমত, রোমান হরফে বাংলা লেখা কতটা যুক্তিযুক্ত; দ্বিতীয়ত, আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রাসঙ্গিকতা; তৃতীয়ত, বাংলা লিপি, বানান ও ভাষা-সংস্কারের গ্রহণযোগ্যতা।

রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার লিপি হিসাবে রোমান বা ইংরেজিকে গ্রহণ করানোর প্রয়াস হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা নতুন নয়। অবিভক্ত ভারতে এর চেষ্টা অনেক আগেই হয়েছিল। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ প্রথম ভারতীয় ভাষাসমূহ রোমান লিপিতে লিখতে উদ্যোগী হন। এরপর স্যার চার্লস ট্রিবিল্যান, ড. ডফ্‌, পার্শ, টমাস প্রমুখ ইংরেজ ব্যক্তিত্ব এই কাজে উদ্যোগী হন কিন্তু কেউই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেননি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর ড. মোহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান-এর মতো পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েজন শিক্ষাবিদ রোমান হরফে বাংলা লেখাকে সমর্থন করেন। সমালোচক রেজোয়ান সিদ্দিকি, মুনীর চৌধুরীর ‘বাংলা গদ্যরীতি’ বই থেকে রোমান হরফে বাংলা লেখার যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন হয় তা হল—বাংলা হরফ পাকিস্তানের জাতীয় লিপি নয়। বর্তমান বাংলা হরফের অনেক দোষত্রুটি রয়েছে; যেমন অতিরিক্ত অক্ষর সংখ্যা, দীর্ঘস্বর, তিন ‘শ’, দুই ‘ব’, দুই ‘জ’, দুই ‘ন’, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি। এই হরফ-সমুদ্রের মধ্যে শিল্পের উৎসাহ তলিয়ে যায়। রোমান হরফে অক্ষর সংখ্যা কম হবে এবং নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হবে। টাইপ-রাইটারে সুবিধে হবে। রোমান হরফে লিখন-দ্রুতি ও পঠন-দ্রুতি বাঙলার চেয়ে বেশি। বিদেশিদের পক্ষে বাংলা শেখা সহজ হবে।[৮০]

এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ভাষা-শিক্ষা কখনই জাতীয় আদর্শের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না, তা একান্তই মানুষের জন্মগত সাংস্কৃতিক অধিকার। কেবল ব্যবহারিক সুবিধার উপরে ভাষা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং উপরিউক্ত সুপারিশগুলি একটিও প্রতিষ্ঠা পায়নি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ভাষা-কমিটি শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, উচ্চ সরকারি কর্মচারীসহ ৩০১ জনের উপর একটি সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষায় ১৮৭ জনই বাংলা হরফে বাংলা শিক্ষার পক্ষে মত দেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার ‘জাতীয় শিক্ষা কমিশন’ গঠন করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি এই কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কমিশনকে প্রথমে দেশের শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তীতে রোমান হরফে বাংলা ও উর্দু শিক্ষা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়েও মতামত জানাতে বলা হয়। কমিশন তাদের মতামত ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অগাস্ট রিপোর্ট আকারে সরকারের কাছে জমা দেয়। এই

রিপোর্টে কমিশন রাষ্ট্রভাষার লিপির প্রশ্নে বাংলা ও উর্দু ভাষাকে উন্নত করে রোমান হরফ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে।

সরকার জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে এবং তার বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। কিন্তু এই রিপোর্ট প্রকাশের পর পূর্ব-পাকিস্তানে রোমান হরফ প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানে বিক্ষোভ থামাতে সরকারকে গুলি চালাতে হয়। এই রকম বাধার সম্মুখীন হয়ে সরকার এই রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত করে দেয়। এমনকি বাংলায় রোমান হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখান করে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। ঐদিন আইয়ুব খান সরকার যে নতুন সংবিধান প্রবর্তন করে তার "Protection of Language and Culture" নামক ১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— "No law should prevent any section of the community from having a district language scripts or culture of its own."[৮১] এইভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনের চাপে বাংলায় রোমান হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল।

আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস:- পাকিস্তান সরকার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষাকে অবদমিত রাখবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার অন্যতম ছিল আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস। এই পরিকল্পনা প্রথম গ্রহণ করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন শিক্ষাসচিব ফজলে আহমদ করি ফজলী। শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ছিলেন এই প্রস্তাবের সমর্থক। এঁরা দুজন চট্টগ্রামের মৌলানা জুলফিকার আলীকে দিয়ে 'হুরুফুল কোরাণ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে আরবি হরফ বাংলাতে প্রবতর্নের ব্যবস্থা করেছিলেন। জুলফিকার আলীকে 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি'র উর্দু হরফ সাব-কমিটির সদস্য করা হয় এবং পরিকল্পনা মতো তিনি কমিটির সদস্য হিসেবে প্রধান কমিটির কাছে বাংলা ভাষায় উর্দু হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।[৮২] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর করাচিতে 'নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে ফজলুর রহমান এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং পাকিস্তানের শিক্ষাকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার কথা বলেন। আরবি হরফ সম্পর্কে তার এই বক্তব্য ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় তিনি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।[৮৩] ১৯৪৯

খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় 'আরবী হরফে বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল হক পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সমালোচনা করেন। আরবি হরফে বাংলা চালু করলে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সংযোগ স্থাপিত হবে এই যুক্তি খণ্ডন করে তিনি ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেন। যেখানে হরফ কেবল নয় ভাষাই এক তা সত্ত্বেও আত্মিক সংযোগ ঘটেনি। এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২০টি শিক্ষা কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরিতে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে অলি আহাদ আরবি হরফ প্রবতর্নের বিরোধিতা করে একে পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন।[৮৪] আসলে জাতীয় ভাবাদর্শের আবেগে অন্ধ হয়ে পাকিস্তানের শাসকশক্তি এটা উপলব্ধি করতেই পারেনি যে ভাষার হরফ পরিবর্তন একটি হাস্যকর প্রয়াস। এতে ভাষা-শিক্ষা সহজ হয় না বরং তা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। যদিও পাকিস্তান সরকার তাদের আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের অপচেষ্টাকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের উপর যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। শিক্ষিত বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্মিলিত আপত্তির ফলে আরবি হরফ প্রবর্তনের এই প্রয়াস শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

বাংলা লিপি, বানান ও ভাষা-সংস্কার:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার সংস্কারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ভাষা-সংস্কারের প্রধান তিনটি দিক ছিল—লিপি-সংস্কার, বানান-সংস্কার এবং ভাষা-সংস্কার। এই সংস্কারে তিনটি প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল—১) পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি, ২) বাংলা একাডেমী, ৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো।

১) পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি:- ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ, সহজীকরণ ও সংস্কারের জন্য পাকিস্তান সরকার 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি' নামে একটি কমিটি স্থাপন করে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও কবি গোলাম মোস্তফা যথাক্রমে এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন হবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ড. আবদুল মোতালেক মালিক, ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আবুল হাসানাৎ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, গণেশচন্দ্র বসু প্রমুখ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২ মে কমিটির তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে হরফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রোমান হরফের কথা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। অতঃপর আরবি হরফকে উর্দু হরফ বলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় বাংলার জন্য যে হরফের কথা বলা হচ্ছে সেটি বর্ধিত আরবি হরফ-উর্দু।[৮৫] এক্ষেত্রে উর্দু হরফই প্রাসঙ্গিক। কাজেই উর্দু হরফ ও সহজীকৃত বাংলা হরফের মধ্যেই কমিটি তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে। বৈঠকের শেষে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে উর্দু ও সহজীকৃত বাংলা হরফ প্রবর্তনের আগে এই দুই হরফের উপযোগিতা বিচার করা দরকার। ঐদিনই 'ভাষা-সংস্কার উপ-কমিটি' নামে একটি উপ-কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই উপ-কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল ব্যাকরণ, বানান, বর্ণমালা ইত্যাদিসহ বাংলা ভাষার সরলীকরণ, সংস্কার ও প্রমিতকরণ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ২০ অগাস্ট 'বাঙলা ভাষা কমিটি'র চতুর্থ বৈঠকে আরো দুটি উপ-কমিটি তৈরি হয়েছিল--'উর্দু লিপি উপ-কমিটি' এবং 'প্রতিবর্ণীকরণ উপ-কমিটি'। 'উর্দু লিপি উপ-কমিটি'র কাজ ছিল বাংলা অনুচ্ছেদ উর্দু লিপিতে প্রতিবর্ণীকরণ করা এবং প্রতিবর্ণীকরণের মূল নিয়মাবলী উল্লেখ করা। 'প্রতিবর্ণীকরণ উপ-কমিটি'র কাজ ছিল বিদেশি শব্দের বিশেষত আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজির প্রতিবর্ণীকরণের আদর্শ পদ্ধতি সুপারিশ করা।[৮৬] ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি'র পঞ্চম বৈঠকে উর্দু 'লিপি উপ-কমিটি'র রিপোর্টের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। 'উর্দু লিপি উপ-কমিটি' তাদের রিপোর্টে কোরাণ পাঠের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ করে বাংলা হরফের পরিবর্তে উর্দু হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিল। এছাড়াও তারা তাদের রিপোর্টে উর্দু হরফে বই পড়ানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি মুদ্রক, প্রকাশক ও সংবাদপত্রের মালিকদের কাছে উর্দু হরফ চালু করার আবেদন জানিয়েছিল।

কিন্তু ভাষা-কমিটি, 'উর্দু লিপি উপ-কমিটি'র সুপারিশগুলো পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসে যে উর্দু হরফে বাংলা লিপি প্রবর্তন অসম্ভব। এই বৈঠকেই 'ভাষা-সংস্কার উপ-কমিটি'র রিপোর্টটিও আলোচনা করা হয়। 'ভাষা-সংস্কার উপ-কমিটি'র অধিকাংশ সুপারিশ ভাষা-কমিটি হুবহু মেনে নেয় এবং তা প্রয়োগের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে চাপ দিতে থাকে। 'ভাষা-সংস্কার উপ-কমিটি' তাদের সুপারিশে উল্লেখ করে যে কমিটি-প্রস্তাবিত সংস্কারকৃত বাংলাকে 'শহজ বাংলা' বলা হবে। 'শহজ বাংলা'কে বৈপ্লবিক নয়, বিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হতে দিতে হবে, যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিকাশ ঘটালে তাতে এর অন্তর্স্বরূপ নষ্ট হবে।...সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে বাংলা ব্যাকরণকে মুক্ত করতে হবে। বাংলা ব্যাকরণের পাঠক্রম সহজ করতে হবে, ব্যাকরণের সূত্রাদি সহজ করতে হবে। লিপি, বর্ণমালা ও বানান সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে উপ-কমিটি বলে 'শহজ বাংলা'য় কেবল লিপি ব্যবহার করা হবে। স্বরবর্ণের সংখ্যা হবে ৭টি-অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। স্বরচিহ্নের ক্ষেত্রে আ-কার, উ-কার এবং অ্যা-কারের কোনো পরিবর্তন হবে না। ই-কারের চিহ্ন হবে ী, এ-কারের প্রচলিত চিহ্নটিই অক্ষরের পরে বসবে।.... যুক্তাক্ষর থাকবে না। তা ভেঙে লিখতে হবে। যেমন: রক্ত = রক্‌ত। ফলা-চিহ্ন তাকবে না। যেমন, র-ফলা, রেফ্, মূর্ধণ্য ণ-ফলা, ন-ফলা, ল-ফলা থাকবে না। উচ্চারণ ভেঙে লিখতে হবে।[৮৭]

তিনটি উপ-কমিটির রিপোর্ট একত্রিত করে বিবেচনার পর 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি' ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিলেও ততদিনে বিরোধিতার আভাস পেয়ে প্রাদেশিক সরকার সেটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের সময়ে রিপোর্টটি প্রকাশিত হলেও সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

২) বাংলা একাডেমী:- বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা সংস্কারের পূর্বে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৮, ৯ ও ১০ জুন একাডেমীর ২৫-তম সভার শেষ দিনে 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি'র সুপারিশগুলি বিবেচনা করে দেখে। তারা ভাষা-কমিটির পুরো রিপোর্টটি সংশোধন না করলেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংশোধনের প্রয়াস করেছিল। ভাষা-কমিটি তাদের সংস্কারকৃত বাংলা ভাষার নাম দিয়েছিল 'শহজ বাংলা।' কিন্তু বাংলা একাডেমীর কার্যকর সংসদ সিদ্ধান্ত নেয় এই নাম হবে 'পাকিস্তানী বাংলা' বা 'পাক বাংলা'। বোঝা যায় তারা

রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে তাদের পার্থক্য দেখাতে কতটা তৎপর ছিল।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমী 'Bengali and Urdu : A Literary Encounter' নামে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এই সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের একত্রিত করে পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয় সংহতিকে আরো শক্তিশালী করে তোলা। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতির ভীত সুদৃঢ় করে তোলার জন্য একাডেমির পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান তিন দফা দাবি জানিয়েছিলেন—

(১) ব্যাপক অনুবাদের ব্যবস্থা করা;

(২) পূর্ব বাংলার স্কুলে উর্দু ও পশ্চিম-পাকিস্তানের স্কুলে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা; ও

(৩) উর্দু ও বাংলা ভাষার সাধারণ শব্দ গুলি খুঁজে বের করে জনপ্রিয় করা।[৮৮]

এই প্রস্তাবের প্রথমটি ও তৃতীয়টির কিছু যৌক্তিকতা থাকলেও দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কার্যকর করা ছিল একেবারে অসম্ভব। বাংলা একাডেমী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে একটি 'ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠন করেছিল। স্মৃতিচারণার আবুল কাসেম এই কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে বলেছেন—"১৯৬৩ সনে বাংলা একাডেমী তার তদানীন্তন ডিরেক্টর জনাব আলী আহসানের নেতৃত্বে এবং ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, তদানীন্তন ডিপিআই ফেরদাউস খান, মুনীর চৌধুরী এবং আমাকে ও আরো অনেককে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এই কমিটিও আমাদের ভাষা ও ব্যাকরণকে সংস্কার করার সুপারিশ করে।"[৮৯] এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা বানান ও লিপি সম্পর্কে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সিদ্ধান্তগুলি সবই ছিল বর্ণমালা ও বানান সম্পর্কিত।[৯০]

বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে সাংবাদিক সম্মেলনে এইসমস্ত সুপারিশগুলি ব্যাখ্যা করে। এই সময় 'ভাষা সংস্কার কমিটি'র পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু ড. মুহম্মদ এনামুক হক ও রফিকুল ইসলাম একাডেমির এই সংস্কার সুপারিশের বিরোধিতা করেন। রফিকুল ইসলাম বলেন—"যেহেতু ভাষা, সাহিত্য ও তার বর্ণমালার মালিকানা এবং অভিভাবকত্ব ঐ ভাষার সাধারণ ব্যবহারকারীদের অর্থাৎ

জনসাধারণের সে কারণে কোন ভাষার লিখন-প্রণালী কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞের একচেটিয়া ব্যাপার হতে পারে না .... যখন কোন বর্ণ বা বানান বাবহারিক দিক থেকে একেবারেই অবাস্তব হয়ে পড়ে এবং নতুন কোন অভ্যাস ইতিমধ্যেই চালু হয়ে যায় তখন বিশেষজ্ঞদের ছাড়াই বানান বা লিপি-সংস্কার সাধিত হয়। এটাই স্বাভাবিক পথ।"[৯১] ভাষা সংস্কার কমিটি বাংলা ভাষার সংস্কারের নামে সরলীকরণের উপর বেশি জোর দিতে চেয়েছিল। বর্ণের তুলনায় কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেছিল ধ্বনির উপর। কিন্তু ভাষার গৌরব কেবল ধ্বনির মধ্যেই নিহিত থাকে না। সাহিত্য গড়ে ওঠে বর্ণমালার বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে। প্রয়োজন ছাড়া বর্ণের সংখ্যা কমিয়ে দিলে বর্ণমালার ভারসাম্য নষ্ট হবে।

৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:- ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পর্ষদ বাংলা ভাষার সংস্কার ও সরলীকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। অন্যান্য সদস্যরা হলেন আবদুল হাই, ওসমান গণি, সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়াসেন, আবুল আসেম, ইব্রাহীম খাঁ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। কমিটির কাজ ছিল বাংলা বর্ণমালা, ব্যাকরণ ও ভাষার সংস্কার ও সরলীকরণ। কমিটি **১৯৬৮** খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ বৈঠকে তাদের সিদ্ধান্ত সুপারিশের আকারে শিক্ষা-পরিষদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এনামুল হক, আবদুল হাই এবং মুনীর চৌধুরী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে তাঁদের ভিন্ন বক্তব্যও টীকার আকারে মূল প্রতিবেদনের সঙ্গে শিক্ষা-পরিষদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিয়াল্লিশ জন বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদে বিবৃতি দেন। তাঁদের বিবৃতি ১ সেপ্টেম্বর 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই একতরফাভাবে গৃহীত বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখন রীতি চালু হলে যারা সবে পুরানো নিয়মে শিক্ষা লাভ শুরু করেছে তাদের ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। যারা শিক্ষিত, নতুন ভাষা-শিক্ষা তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করবে। সবমিলিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হবে। কবি জসীমউদ্দীন ৩০ অগাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুপারিশের বিরোধিতা করে বলেন এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি আংশিক সহমত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হরফ ও বানান সংস্কার মেনে নিলে—'আমাদের বংশধরদিগের একচক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।'[৯২] এই রিপোর্ট সরকারিভাবে বাস্তবায়িত করার আগেই

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে বানান ও ভাষা-সংস্কারের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

২.গ.আ. পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র-বিতর্ক:-

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জীবন থেকে বাংলা সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে তাদের ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা পশ্চিম-বাংলার লেখক বলে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবন থেকে মুছে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে হাসান মুরশিদ বলেছেন—"পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির ওপর সরকারি জুলুম এসেছে নানাপথে। রবীন্দ্রনাথের ওপর উদ্ধত আক্রমণ তার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের পরাজয় এবং বিলোপ যেহেতু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পরাজয় এবং বিলোপের নামান্তর তাই তিনি হিন্দু বলে, মুসলিমবিরোধী বলে, পক্ষপাতদুষ্ট বলে নিন্দিত হয়েছেন।"[৯৩] এই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহলে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আলী আহসান 'পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' নামক একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন—"মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মিলবে আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে।....নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সেইসঙ্গে এটাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি।"[৯৪] অস্বীকার করার এই প্রবণতাই পরবর্তীকালে বিরোধিতার রূপ নিয়েছিল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' পশ্চিম বাংলার সাহিত্যকেই নিষিদ্ধ করে পক্ষান্তরে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র-বিতর্ক চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়—"সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুরাগী ও ভক্ত। তাহাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে

নাই, তারা এই সুযোগে তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।''[৯৫] রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা শহরে তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছিল—১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কমিটি, ২) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস.এম মুর্শেদের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি, ৩) ঢাকার প্রেস ক্লাবের তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের উদ্যোগে গঠিত রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কমিটি ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ কার্জন হলে বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সুফিয়া কামাল সকল রাজনৈতিক চেতনার উর্ধ্বে উঠে রবীন্দ্রনাথকে মহান কবি আখ্যা দেন। বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি চারদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, নাটক মঞ্চায়ন, সঙ্গীতানুষ্ঠানের পাশাপাশি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। এই আলোচনা সভায় সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রেসক্লাবের কমিটির অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, নাটক, চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। এই তিনটি কমিটি একত্রে ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ বৈশাখ চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান পালন করেছিল। এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক মাথাচাড়া দেয়নি। দেশে এই সময় সামরিক শাসন জারি থাকার জন্য বেসরকারি বিরোধিতা সেভাবে তীব্র আকার ধারণ করেনি। কিন্ত ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের 'ছয় দফা' আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ঘোষণা করেন যে, রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা হবে। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিবাদ শুরু হয়। বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমানসহ একাধিক বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদে বিবৃতি দেন। সরকারিভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বর্জনের কোনো আদেশনামা প্রকাশিত না হলেও পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছে এই মর্মে আন্দোলন শুরু হয়। ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই বিক্ষোভে যোগদান করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার বিরোধিতা করেন আবুল হাশিম এবং কবি জসীমউদ্দীন। রাজনৈতিক দলগুলিও এই ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার

সুযোগ গ্রহণ করে। ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন—"তথ্যমন্ত্রী জনাব সাহাবুদ্দীন ঘোষণা করেছেন যে, রবীন্দ্র সঙ্গীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্যের পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিসন মারফত পরিবেশিত হবে না।.... ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই যাঁরা ইসলামের নামে, রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাই আমি এদেশের মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।"[৯৬] রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার এই প্রস্তাব এতটাই উত্তেজনা ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছিল যে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে যায় এবং বিতর্কের অবসান ঘটে। সেই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, নাটক সমস্ত কিছুই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তারই অচিন্তিত পরিণাম হল স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রতিষ্ঠা।

৩. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অগাস্ট ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল 'পাকিস্তান' নামক নতুন রাষ্ট্র। যদিও ধর্মের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়েছিল এই বিভাজন, তবুও মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে তাঁদের আদি সংস্কৃতির দেশ যে আরব—এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। এ-কারণে অ-বাঙালি মুসলমানরা প্রথম থেকেই অতিরিক্ত গুরুত্ব পেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেল এই দুটি বৃহৎ ক্ষমতাশালী প্রশাসনিক পদ পশ্চিম-পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। বলা যেতে পারে সূচনাপর্বেই সমগ্র পাকিস্তানের প্রশাসনিক রাশ নিজেদের হাতে রাখতে তৎপর হয়ে ওঠেন পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসী মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এবং মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা। এই দমন প্রক্রিয়ায় একদিকে ছিল উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, অন্যদিকে ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা। আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদটিকে আলোচনার সুবিধার্থে দুটি ভাগে বিভক্ত করবো। প্রথম ভাগে থাকবে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বৈষম্যের বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগে থাকবে আর্থিক বৈষম্যের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সংকট ও সেই সূত্রে গঠিত বিভিন্ন আন্দোলনসমূহের বর্ণনা।

৩.ক. অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর ভৌগোলিক ব্যবধান। পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ছিল সহস্র মাইলের। ফলে এই দুই প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি মূলত এই দূরত্বগত ব্যবধানের জন্য। শুধু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ব্যবধান নয়, মৌলিক সম্পদের বিন্যাস এবং মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য যেমন আয়তন, জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি, সেচ, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, শিল্প, যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগত পরিকাঠামোর দিক থেকেও পূর্ব-পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। আমরা এই সমস্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে দুই প্রদেশের মধ্যেকার বৈষম্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

৩.ক.অ. আয়তন, জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি:

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান গঠিত হলেও এই রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি থেকে জানা যায় তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট আয়তন ছিল ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৩৭ বর্গমাইল। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৫৪ হাজার ৫০১ বর্গমাইল। বাদ বাকি ৩ লক্ষ ১০ হাজার ২৩৬ বর্গমাইল এলাকাই ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের। অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট আয়তনের মাত্র ১৪.৯৪ ভাগ পেয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান। আয়তনের দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তান ছোট এলাকা হলেও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ লোক বসবাস করত ৫৪ হাজার ৫০১ বর্গমাইলের এই ক্ষুদ্র পূর্ব-পাকিস্তানে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী তৎকালীন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪২ হাজার। এর মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার জন বাস করত পূর্ব-পাকিস্তানে। ফলত দেখা যায় পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে মানুষ বাস করত ৭৭৭ জন। আর পশ্চিম-পাকিস্তানের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২০৮ জন।[৯৭] এর থেকে বোঝা যায় প্রথম থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান জনস্ফীতির শিকার হয়েছিল। জনসংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে গিয়েছিল। ফলে জনগণের আয় স্বাভাবিকভাবে কমে গিয়েছিল। এম. এম. আকাশ ১৯৪৯-৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় আয় সংক্রান্ত যে তথ্য তুলে ধরেছেন তা সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হল।[৯৮]

বিষয়	বছর					
	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫
মোট জাতীয় উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	১১৫৬৯	১২২৯৫	১২৭৪৯	১৩১১৪	১৩৫১৫	১৩২৮৮
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪২.২৫	৪৩.২৯	৪৪.৩৬	৪৫.৪৫	৪৬.৫৭	৪৭.৭২
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২৬৭	২৭৫	২৭৭	২৭৯	২৮৪	২৭১
জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৬	৩	২	৩	(-)২

মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৩.৭২	.৭২	১.৭	১.৭	(-)৫

উপরিউক্ত সারণি থেকে বোঝা যায় প্রথমদিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীকালে এই বৃদ্ধির হার প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় মাথাপিছু আয় বাড়েনি এমনকি পরবর্তীকালে কমেও গেছে। বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে কমে গেছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে মাথাপিছু আয়। ১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানের একজন ব্যক্তির মাথাপিছু আয় ছিল ২৬৭ টাকা। পাঁচ বছর পরে তা ৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৭১ টাকায়।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার। এর মধ্যে শহরে বাস করত মাত্র ৪ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৭৫ জন। অন্য দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের মোট জন সংখ্যার ১৭.৬ শতাংশ অর্থাৎ ২০ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৫২ জন বাস করত শহরে। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় দ্বিগুণ লোক শহরের অধিবাসী হওয়ার জীবনযাপন ও জীবিকার দিক থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিল। সামাজিক বৈষম্যের ফারাক এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। এই উদ্বাস্তুদের আগমন পাকিস্তানের দুই অংশের আর্থিক বিকাশে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় ১৯ গুণ বেশি উদ্বাস্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল।[৯৯] পশ্চিম-পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার সরকারি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ করাচি ও পাঞ্জাবকে অর্থনৈতিকভাবে অধিক সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের আগমন ছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে উদ্বাস্তু হয়েও এইসব মানুষরা সরাসরি সরকারি সুবিধা লাভ করেছিলেন অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের মূল জনগণই সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যে-সমস্ত উদ্বাস্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই সক্রিয় শ্রমশক্তির অংশ ছিল। কারণ করাচি ও পাঞ্জাব শহুরে এলাকা হওয়ার, এইসব অঞ্চলের জনগণ সহজেই কল-কারখানায় নিজেদের কর্ম-সংস্থান করতে পেরেছিলেন।

উদ্বাস্তুরাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তান ছিল কৃষিভিত্তিক। একইসঙ্গে সেখানে কম সংখ্যায় হলেও যে পরিমাণ উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল গ্রামীণ অর্থনীতির কারণে তাঁদের পরনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে সক্রিয় শ্রমশক্তির অভাব পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানে সক্রিয় শ্রমশক্তির পেশাগত বিন্যাস ছিল প্রবলভাবে কৃষিমুখী। ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেবর্তী সময়কালে এই কৃষিমুখিনতা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পূর্ব-পাকিস্তান ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছিল।[১০০] দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পূর্ব-পাকিস্তান কৃষিক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। অতিরিক্ত মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় গ্রামীণ এলাকাগুলিতে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ কখনই প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি। অন্যদিকে এই সময়কালে শহরের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রামীণ ও শহুরে মানুষের জীবনযাত্রায় বৈষম্য দেখা দিয়েছে।[১০১] ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী বছরগুলিতে পূর্ব-পাকিস্তানের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। এর জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের অতিরিক্ত কৃষি-নির্ভরতাকে দায়ী করা যায়। ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বছরের সময়সীমায় পূর্ব-পাকিস্তান কৃষি-নির্ভরতা কমাতে না পারায় তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার থেকে উত্তরণের কোনো পথ তারা বের করতে পারেনি। এই কারণে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরবর্তী দশ বছরের দিকে তাকালে দেখা যায় সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান তাল মেলাতে পারেনি, তারা একইভাবে কৃষি-নির্ভর থেকে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তান কৃষি-নির্ভরতা কমিয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে পশ্চিম-পাকিস্তানের কৃষি নির্ভরতা কমেছে ৫.৪ শতাংশ। অন্যদিকে এই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষি-নির্ভরতা ২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১০২] স্বাভাবিকভাবে এর প্রভাব পড়েছে জাতীয় উৎপাদনে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ২০ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে মাথাপিছু গড় আয় ৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৩২১ টাকা। অর্থাৎ প্রতিবছর মাত্র ৪ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হয়েছে। এই সময় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় উৎপাদনকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।[১০৩] এ-কারণেই জাতীয় উৎপাদনের সুফল পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করতে পারেনি।

৩.ক.আ. কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা

প্রথম থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমত, জমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য; দ্বিতীয়ত, জমির অনুর্বরতা। ১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানে মোট জমির পরিমাণ ছিল ৩৪,৯৩৬ একর। এর মধ্যে ২০,০৯৬ মিলিয়ন একর প্রথম থেকেই চাষযোগ্য ছিল। বাদবাকি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬২৭২ একর। সুতরাং মোট জমির প্রায় ৭৫ শতাংশই ছিল চাষের অনুকূল।[১০৪] এই জমির উপর অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল ১০.৭৫ শতাংশ। এরা প্রত্যকেই স্বাধীন চাষি ছিল না। মালিক ছাড়াও, বর্গাদার ও ভাগচাষিও ছিল। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী তৎকালীন সময়ে কৃষিক্ষেত্রে ১০৭১৫৪৬৭ জন চাষির মধ্যে মালিক চাষির সংখ্যা ছিল ৩৭৪৩০৮২ জন (৩৪.৯৩%), মালিক এবং বর্গাচাষির সংখ্যা ৪৩৩৪৮৮৯ জন (৪০.৪৫%), বর্গাচাষির সংখ্যা ছিল ৬২১২৯৯ জন (৫.৮০%), বর্গাচাষি এবং ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ছিল ৪১০৭২১ জন(৩.৮৩%), ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ছিল ১৫১৩৬২৯ জন(১৪.১৩%)। ফসল বর্হিভূত কৃষিকাজে নিয়োজিত মজুরের সংখ্যা ছিল ২৫৩০৫ জন(০.২৪%)।[১০৫] অর্থাৎ ভূমির মালিকানা ছিল ৭৫ শতাংশের হাতে। এর পরেই ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ শতাংশ।

পূর্ব-বাংলার প্রধান ফসল ছিল ধান। বছরে তিন বার আউস, আমন ও বোরো ধানের চাষ করা হত। ১৯৪৭ থেলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব-পাকিস্তানে যে অনুপাতে ধান জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই হারে উৎপাদনশীলতা বাড়েনি। ফলে একর প্রতি ফলন হ্রাস পেয়েছে। এই ফলন হ্রাসের পিছনে দুটি কারণ দায়ী ছিল—জলসেচের অপ্রতুলতা ও অপর্যাপ্ত ঋণ।[১০৬] ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ২০.০৯ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে সেচের আওতাধীন

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ ৪ হাজার একর। সুতরাং মোট আবাদি জমির মাত্র ১.৮২ শতাংশ ছিল সেচের আওতায়। বাকি জমির চাষ নির্ভর করত বৃষ্টিপাতের উপর। সেদিক থেকে জলসেচের মাত্রা ছিল অতি নগণ্য। একই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে চাষিদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৩০০০০ সমবায় প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু এগুলির মাধ্যমে মোট চাহিদার মাত্র ১২ শতাংশ ঋণ দেওয়া সম্ভব হত। বাকি ৮৮ শতাংশ ঋণ চাষিকে নিতে হত মহাজনদের কাছ থেকে। অর্থাৎ এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থা ছিল সংকটাপন্ন।[১০৭]

৩.ক.ই. শিল্প

কৃষির পরে শিল্পের দিকে তাকালেও দেখা যায় বিভাগ পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্পক্ষেত্র পড়েনি। ব্রিটিশ আমলে সমগ্র ভারতের মোট শিল্পের ৩৩ শতাংশ শিল্প ছিল বাংলায়। ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তান ঐ ৩৩ শতাংশের মাত্র ২.৭ শতাংশের উত্তরাধিকারী হয়। এই সময় পূর্ব-পাকিস্তান যা পেয়েছিল তা হল—৫০০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ২৬০০ লুম এবং ১১২০০০ স্পিণ্ডল সম্বলিত ৭টি কাপড়ের কল, ৫টি চিনির কল, ৩৫-৪০ টি জুট বেলিং প্রেস, ৭৭০০ একর চা বাগান ইত্যাদি।[১০৮] পূর্ব-পাকিস্তান প্রধানত পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হলেও প্রথম দিকে পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো পাটকল ছিল না। কিছু জুট বেলিং প্রেস ছিল মাত্র। অবিভক্ত ভারতে পূর্ব-বাংলা ছিল কাঁচা পাট রপ্তানিকারক প্রদেশ। পাকিস্তান তৈরির পর ভারতে পাট রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলে পাটকে কেন্দ্র করে শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত করা যায়নি। উৎপাদিত পাটের ২৭ শতাংশ পাকিস্তানের কলগুলিতে ব্যবহৃত হত। ৭৩ শতাংশ পাট বিদেশে রপ্তানি হত। কিন্তু সেখানেও দুর্বল রপ্তানি ব্যবস্থার জন্য রপ্তানি কমে যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবহণ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না, সঙ্গে ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা। এ-প্রসঙ্গে আজিজুর রহমান খান বলেছেন—“The next problem is of *finance.* The primary intermediaries are mostly self-financed and no

bank credit is available at this stage. This greatly limits the volume of their business."[১০৯]

১৯৪৯ থেকে **১৯৫৫** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়পর্বে কৃষির উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদন যথাক্রমে **১১** ও **১৫** শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। দৈনিক আয় ক্রমশ কমেছে।[১১০] কৃষিখাতের তুলনায় শিল্পখাতে শ্রমিক সংখ্যা নগণ্য হলেও কৃষির তুলনার শিল্প সামান্য পরিমাণে হলেও বৃদ্ধিতে এগিয়ে ছিল। কিন্তু সেই হারে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পায়নি।[১১১] শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের ব্যয় কমেছে। অর্থাৎ আলোচ্য কালপর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রমিকরা বর্ধিত শিল্পোৎপাদনের কোনো সুফল লাভ করতে পারেনি।

১৯৫১ থেকে **১৯৬৪** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের মধ্যে দ্রব্য আদান-প্রদান এই সময়পর্বের অর্থনৈতিক বিকাশকে কিছুটা ফুটিয়ে তোলে। অবিভক্ত ভারতে পূর্ব-বাংলার সঙ্গে ভারতের যে রপ্তানি সংক্রান্ত সম্পর্ক ছিল বিভাগ-পরবর্তী পর্বে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে বিনিময় প্রথা শুরু করে। প্রথম থেকেই পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তান দেশীয় বিনিময়ের দিক থেকে এগিয়ে ছিল। পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে এই হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ষাটের দশকে এসে এই বিনিময় হ্রাস পেতে থাকে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিময় আরো কমে যায় কারণ ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়-দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ নতুন দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, একইসঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হয় যার প্রভাব পড়ে এই পর্বের পণ্য বিনিময়ে।[১১২] যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের এই পরিসংখ্যান ততটা উল্লেখযোগ্য নয় কারণ রাজনৈতিক রোষের শিকার হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নতির প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ততটা উৎসাহ দেখায়নি।

৩.ক.ঈ. শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বিকাশ শিক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা বরাবর পশ্চিম-পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। শিক্ষার হারের দিক থেকেও পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে ছিল।[১১৩] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে দেখা যায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের শিক্ষার হার পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলানয় বেশি হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানে বহু গুণে বেশি ছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতেও এই বৈষম্য তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতির তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ প্রাথমিক পর্বে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থাকে পশ্চিম-পাকিস্তান কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগ্রহ লাভের কারণে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাতের ফল ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের এই সময়পর্বের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানে যে পরিমাণ স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছিল সেই তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যাটা ছিল লজ্জাজনক।[১১৪]

১৯৫১ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরে পাকিস্তানের স্নাতক-পূর্ববর্তী স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক। সমগ্র পাকিস্তানে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের স্নাতক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের তুলনার ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে স্নাতক শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি। স্নাতক-পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংকট আরো তীব্র। এই স্তরে কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে তা নয়। এই সময় সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে স্নাতক-পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত একজনও মহিলা প্রার্থী পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে স্নাতক পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১৫] শিক্ষার পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক এই অনগ্রসরতার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের একটি প্রদেশের প্রতি ইচ্ছাকৃত বিরূপ

আচরণকে অস্বীকার করা যায় না। এই দশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা দেখায়নি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। উল্টে সরকারি সাহায্যের অভাবে বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। মূলত এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজ না থাকায় বহু প্রার্থী শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেরো বছর পরেও পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার হার ঋণাত্মক থেকে গেছে। এর প্রভাব পড়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানের সামাজিক জীবনে। শিক্ষাকে সামাজিক বিকাশের অন্যতম মাপকাঠি বলে ধরা হয়। কিন্তু শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে দিনের পর দিন পূর্ব-পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের, যারা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সরকারি বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। তাদের এই ক্ষোভকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। এ-কারণে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের গণ-জাগরণেরই ফল ১৯৭১-এর নবরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

৩.খ. আর্থিক বৈষম্যজনিত সামাজিক সংকট ও বিভিন্ন আন্দোলন

'পাকিস্তান' গঠিত হওয়ার পরই ভৌগোলিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তান প্রথম থেকেই এমন পরিমণ্ডল পেয়েছিল যা শুরু থেকেই তাদের সংকটে ফেলেছিল। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান তৈরির পর পূর্ব-পাকিস্তান কৃষিজমি ছাড়া তেমন কোনো সম্পদ লাভ করতে পারেনি। শিল্প-কারখানা অধিকাংশই পশ্চিম-পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে প্রতিবাদস্বরূপ সংগঠিত হয় বিভিন্ন আন্দোলন। সমগ্র বিষয়টিকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে ভাগ করা হল। প্রথম ভাগে থাকবে দুর্ভিক্ষজনিত সংকট, দ্বিতীয় ভাগে থাকবে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বঞ্চনা ও

বৈষম্যের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন, তৃতীয় ভাগে থাকবে শিল্প-কারখানায় পারিশ্রমিকসহ অন্যান্য দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন।

৩.খ.অ. পূর্ব-পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ

নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে দেশ গঠন করলেও অর্থনৈতিক সংকট থেকে পূর্ব-পাকিস্তান মুক্তিলাভ করতে পারেনি। বিভাগের আগে থেকেই তৎকালীন পূর্ব-বাংলা খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রীদের কাছে খোলা চিঠি দিয়ে যে খাদ্য পরিস্থিতির কথা জানিয়েছিল তা হল— "ঠিক এই মুহূর্তে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে তখন এক ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কট সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।...পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি খুবই খারাপ। চালের মূল্য ৩০ টাকার উপরে উঠে গেছে। কেবলমাত্র ছয় লক্ষ লোকের জন্য রেশনিং চালু হয়েছে এবং সেখানে রেশন দোকানগুলিতে প্রায়ই সরবরাহ বন্ধ থাকে। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন ঘাটতি এলাকায় যে আংশিক রেশনিং চালু করা হয়েছিলো তাও অনেক আগেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।....এর ফলে হিন্দু মুসলমান সকলকেই আজ পাইকারিহারে উপবাস থাকতে হচ্ছে।"[১১৬] এই দুর্ভিক্ষের জন্য সরকারি ব্যর্থতাকে অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গীয় কৃষক সভার চিঠিতে স্পষ্ট যে সরকারি রেশন ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পূর্ব-বাংলা সরকার ব্রিটিশ আমলের কর্ডন প্রথা অনুসরণ করেছিল। এই প্রথা অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের মোট সতেরোটি জেলার মধ্যে আটটি জেলার উদ্বৃত্ত ফসল বাকি এগারোটি জেলায় বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু সরকারি যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থার জন্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়। ফলে পূর্ব-বাংলার জেলাগুলির খাদ্য ঘাটতি এইসময় দুর্ভিক্ষের চেহারা নেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রথা কয়েকটি জেলা থেকে তুলে দেয়। কিন্তু কর্ডন প্রথা উঠে যাওয়ার কিছু ব্যবসায়ী এই সুযোগে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশষ্য মজুত করে নেয়। এই সময় বাজারে নতুন করে খাদ্যশষ্যের আমদানি ঘটেনি ফলে খাদ্য-সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খাদ্য-সংকট এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে সিলেট জেলার একাধিক এলাকায় অর্থাভাবে মানুষ উপবাস করতে শুরু করে। এই সময় প্রাকৃতিক কারণে ফসলও ভালো হয়নি। ফলে পরিস্থিতি মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। একই সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে তাঁর মতামত দিলেও পূর্ব-পাকিস্তানের এই খাদ্য-সংকটের কথা একবারের জন্য উল্লেখ করেননি অথচ পাকিস্তান সরকার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল। এর থেকে বোঝা যায় জিন্নাহ্ ঢাকায় এসেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তাঁকে বিচলিত করেনি।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে খাদ্য পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় চালের দাম প্রতিমণে ২০ টাকারও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ সংকটে পড়ে।[১১৭] এই সংকট নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন মহল তেমনভাবে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু করাচি থেকে প্রকাশিত ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ফ্রিডম'কে বদরুদ্দীন উমর ব্যতিক্রম বলে, ১০ জুলাই এই পত্রিকার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন—''জনসাধারণকে সাহায্য দান হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যাহা করিয়াছে সেখানকার কোটি কোটি বুভুক্ষু বাসিন্দার কাছে তাহার মূল্য নাই-'৪৩-এর সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর অতি সামান্য পরিবর্তনই তাহাদের জীবনে দেখা দিয়াছে-ইহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছে রোগ, মহামারী আর বেকার সমস্যা। ইহা একটি দুবোর্ধ্য রহস্য যে পাকিস্তানের এক অংশে যখন প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে এবং শুধু তাই নয়, সেই খাদ্য হইতে কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করাও সম্ভব হইতেছে-পাকিস্তানের অন্য অংশে তখন দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়া দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে...আমরা কি আমাদের ভাই, বোন ও সন্তানদের মৃতদেহের উপর পাকিস্তানের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে চলিয়াছি? আমাদের সব চাইতে মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য পাটের জন্য যারা হাড়ভাঙা খাটুনি কাটিয়া দেহপাত করে তারা কি পূর্ব পাকিস্তানেরই

বাসিন্দা নয়?"[১১৮] এই রিপোর্টটি একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, পশ্চিম-পাকিস্তানের যে সিদ্ধান্তকে এই পত্রিকা 'দুবোর্ধ্য রহস্য' বলে উল্লেখ করেছে তা মোটেও দুবোর্ধ্য নয়, এটি পশ্চিম-পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পিত চক্রান্ত। পূর্ব-পাকিস্তানকে তারা নিজেদের জাতীয় আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করতে এতটাই উন্মুখ ছিল যে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতিকে তারা রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে দেখেছে। দুর্ভিক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে বিপর্যস্ত পূর্ব-পাকিস্তানকে সহজেই পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তথা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এইসময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়ত, এই পত্রিকার রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় যে পাকিস্তান যে পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জন করে তার সিংহভাগ অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়। যে প্রদেশের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সরকার বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি করে, সেই প্রদেশের সংকটের সময় তাদেরকে সাহায্য না করে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে নিজেদের পক্ষপাতিত্বমূলক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য-সংকট ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে অনেকখানি হ্রাস পেলেও ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আবার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। এই সময় বন্যার ফলে খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ১০ মে সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকা 'খুলনায় দুর্ভিক্ষ' নামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিল।[১১৯]

খাদ্য-সংকটের পাশাপাশি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে লবণ-সংকট চরম আকার ধারণ করেছিল। এই সংকট সময়ে লবণের দাম ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে শেষপর্যন্ত দাঁড়ায় সের প্রতি ১৬ টাকায়। খাদ্য-সংকটের মতো লবণ-সংকটে সাধারণ মানুষ বিপদগ্রস্ত না হলেও সমস্যায় পড়েছিল। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষক ও শ্রমজীবী। এদের অনাড়ম্বর জীবনযাপনে লবণ ছিল আবশ্যিক উপাদান। এই সংকটের কারণ হিসেবে ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতাই স্পষ্টরূপে

প্রকাশ পেয়েছে। ২২ অক্টোবর 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় তাঁর যে বিবৃতি বেরিয়েছিল তার মূল কথা হল—করাচি থেকে লবণের অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষক আড়তদারদের ষড়যন্ত্রই পূর্ব-পাকিস্তানের লবণ-সংকটের মূল কারণ।[১২০] ২৭ অক্টোবর লবণ-সমস্যা আলোচনার জন্য আখতারুদ্দীন আহমদ-এর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সমবেত হয়ে পাকিস্তান সরকারের লবণ নীতির তীব্র সমালোচনা করে। বিভিন্ন মহলের চাপ ও পত্র-পত্রিকার সমালোচনার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নভেম্বর মাস থেকে লবণের দাম কমতে শুরু করে।

৩.খ.আ. পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষক আন্দোলন

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী 'পূর্ব বাঙলা বিধান পরিষদে' 'পূর্ব বাঙলা জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিলে'র যে খসড়া পেশ করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-পাকিস্তানের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে সরকার সাধারণ কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। নানা আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে যে 'জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন তৈরি হয় তাতে সরকারই কার্যত জমিদার হয়ে ওঠে। ফলে কৃষকরা সরকারি কর্মচারিদের শোষণের শিকার হয়েছিল। এই আইনে সরকার ভূমিহীন কৃষকদের জমি বণ্টনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও ঠিকমতো পালন করা হয়নি। ফলে কৃষকদের ক্ষোভ ক্রমেই সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণবিনোদ রায়কে সভাপতি ও মনসুর হাবিবকে সম্পাদক নির্বাচিত করে গঠিত হয় 'পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি'। এই সমিতি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে রংপুর জেলায় তিন দিনের সম্মেলন আয়োজন করে। এই সম্মেলনে আন্দোলন সংক্রান্ত যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা হল—"(ক) নবাব জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিম লীগ সরকার স্বেচ্ছায় কখনো জমিদারি উচ্ছেদ করবে না। কাজেই কৃষিপ্রধান পূর্ব বাঙলায় সুকঠিন ও সুউচ্চ পর্যায়ের

গণ আন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে এবং তা একবার তুলতে পারলে পূর্ব বাঙলার সর্বত্র সেই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে।''[১২১] ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান শাখার নেতৃত্বে সিলেট, খুলনা, যশোর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় কৃষকরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি আন্দোলন ছিল—সিলেটের নানকার আন্দোলন, হাজং বিদ্রোহ এবং নাচোল বিদ্রোহ। পর্যায়ক্রমে এই তিনটি আন্দোলনের কার্যপ্রণালী উল্লিখিত হবে।

নানকার আন্দোলন:- ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলন নানাকার প্রজাদের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল। 'নান' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল রুটি। রুটি অর্থাৎ খাদ্যের পরিবর্তে দৈহিক শ্রমই এই প্রথার দ্বারা বোঝায়। কিন্তু সাধারণ ভৃত্যদের মতো সারাদিনের পরিশ্রম শেষে তাদের খাওয়ার রুটি দেওয়া হত না। তার পরিবর্তে তাদের এক টুকরো জমি বরাদ্দ করা হত। সেই জমিতে তারা ফসল ফলিয়ে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করত। বদরুদ্দীন উমরের মতে—''নানকারকে যে জমি বরাদ্দ করা হতো তার নাম হল 'নান' (রুটির জন্য) জমি। তাকে 'খানে' (খাবার জন্য) বাড়িও বলা হত।''[১২২] এই সামান্য জমি ভোগ করতে দেওয়ার পরিবর্তে জমিদার এইসমস্ত প্রজাদের দিয়ে সমস্ত রকম কাজ করিয়ে নিত এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করত। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জনৈক অজয় ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি সিলেট জেলার বাহাদুরগ্রামে নানকারদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। জোয়াদ আলী ও আবদুশ সোভান (পটল) নামক দুজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তিনি একটি গ্রুপ গঠন করে কাজ শুরু করেন।[১২৩] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দুই শতাধিক নানকার বাহাদুরপুরে 'হদ বেগারি বন্ধ করো' এই ধ্বনি তুলে মিছিল করে প্রকাশ্যে নানকার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। এইভাবে দেশ বিভাগের পূর্বেই বাহাদুরপুরে নানকার কৃষকদের আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলে। অজয় ভট্টাচার্য এই আন্দোলন কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। স্বাধীনতার পর সেপ্টেম্বর মাসে অজয় ভট্টচার্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। এই সময়

সিলেটের গোলাপগঞ্জ এলাকায় এক নানকার এক জমিদারকে জুতো মারলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। জমিদাররা সম্মিলিতভাবে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে'র কাছে অভিযোগ জানালে মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেনসহ তিন সদসের তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটি নানকার ও জমিদারদের বক্তব্য শোনার পর তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে যেখানে কৃষকদের খাজনা হ্রাসের বিষয়টি উল্লেখ করা ছিল। এরপর জমিদাররা ঢাকায় একটি সম্মেলন করে। তাদের দাবি অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নানকার, জমিদার ও সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়—

(১) নানকারদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে শতাধিক বন্দি আছেন তাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে (কমিউনিষ্টদেরকে মুক্তি দেওয়া নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

(২) যে সমস্ত নানকার বাড়ি জমিদার বাড়ির সংলগ্ন সেগুলিকে জমিদার ইচ্ছে করলে উচ্ছেদ করতে পারবে কিন্তু চার পরিবর্তে জমিদার কর্তৃক নানকারকে অন্য জায়গা দিতে হবে। নানকার বাড়ি স্থানান্তরের ব্যয়ও এক্ষেত্রে জমিদারকেই বহন করতে হবে।

(৩) যে সমস্ত জমি নানকারদের দখলে আছে তার অর্ধেক জমিদারকে ছেড়ে দিতে হবে এবং বাকি অর্ধেকে নানকারদের জোত স্বত্ব স্বীকৃত হবে। যে জমিতে নানকারদের জোত সত্ব স্বীকৃত হবে সেগুলি খাজনায়ী জমিতে রূপান্তরিত হবে।

(৪) জমি হস্তান্তর ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ দেখাশোনার জন্যে সেট্‌ল্‌মেন্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। এই অফিসার জমিদারদের আবেদন বিবেচনা, নানকারদের ঘরের মূল্য নির্ধারণ, খাজনার রেট নির্ধারণ ইত্যাদি করবে।[১২৪]

এই চুক্তিতে ঢাকা দক্ষিণ, বাহাদুরপুর ও দাউদপুর এই তিন জেলার জমিদাররা স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে অজয় ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য বন্দিরা মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু এই তিন জায়গা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় এই চুক্তি প্রযোজ্য ছিল না। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুলিশ বাহাদুরপুর অঞ্চলে অত্যাচার শুরু করলে প্রচুর নানকার গৃহহীন হয়ে পাশ্ববর্তী জঙ্গলে ঘুরতে থাকে। এই সময় জমিদার পরিচালিত দালালরা নানকারদের পরামর্শ দেয় জমিদারদের টাকা দিয়ে ঘরে ফেরার জন্য। কিন্তু এই প্রস্তাব মেনে নেওয়াও সকলের পক্ষে আর্থিক কারণেই সম্ভব হয়নি। যে-সমস্ত এলাকায় নানকার আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছিল সব জায়গাতেই সরকার পুলিশ মোতায়েন করে। এই সময় মুসলিম লীগ বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানাতে থাকে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। এই সময় মুসলিম লীগ সরকার 'নানকার প্রথা উচ্ছেদ আইন' প্রণয়ন করলে সিলেটে নানকার আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

হাজং বিদ্রোহ:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর ময়মনসিংহ জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে 'টঙ্ক প্রথা'কে কেন্দ্র করে জমিদার-কৃষক সংগ্রাম চলে আসছিল। টঙ্ক-প্রথা হল এমনই এক প্রথা যেখানে খাজনার বিনিময়ে কৃষকরা জমিতে চাষ করতে পারত। কিন্ত সেই জমির উপর তাদের কোনো স্বত্ব ছিল না। প্রতি বছর জমিদাররা নতুন নতুন কৃষকদের নতুন নতুন হারে খাজনার বিনিময়ে জমি চাষ করতে দিত। এই প্রথা পুরুষানুক্রমিক না হলেও ঋণগ্রস্ত কৃষক মারা গেলে তার ঋণের বোঝা তার সন্তানদের বইতে হত। অথচ সেই জমির উপর মৃত কৃষকের সন্তানের কোনো অধিকার থাকত না। জমিদাররা তাদের ইচ্ছে মতো প্রতি বৎসর খাজনার হার নির্দিষ্ট করত। এর ফলে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের প্রায় ৫০ শতাংশই (প্রায় ৪০ থেকে ৭০ টাকা) টঙ্কা খাজনা দিতে চলে যেত। অথচ সেই সময় সাধারণ সরকারি খাজনার বার্ষিক হার ছিল মাত্র ৬ টাকা।[১২৫] খাজনা আদায়ের নামে এই শোষণই জমিদাররদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের

সূচনা ঘটায়। এই কৃষকরা ছিলেন হাজং অঞ্চলের আদিবাসী হাজংরা। তাই তাঁদের নামানুসারে এই আন্দোলনের নাম হয় হাজং বিদ্রোহ। ১৯৪৭-পূববর্তী সময় থেকে এই আন্দোলন চলতে থাকলেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী সময়ে দেশ বিভাগজনিত কারণে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকেই হাজং অঞ্চলে লেভির নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। কৃষকরা ‘জান দিব তবু ধান দিব না’, ‘লেভির জুলুম বন্ধ কর’, ‘টঙ্ক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কর’ ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে দিকে দিকে মিছিল বার করেন। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মিছিল, আন্দোলন, পুলিশের সঙ্গে সংগ্রাম, গুলিবর্ষণ চলতেই থাকে। সভা-সমিতিও আয়োজিত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী রাংটিয়া পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত গেরিলা ঘাঁটি আক্রমণ করে দখল করে। সবক্ষেত্রেই পুলিশের তুলনায় আন্দোলনকারী কৃষকরা অধিক সংখ্যায় নিহত হতে থাকেন। সরকার এই সময় জমিদারি ক্রয় আইন পাস এবং টঙ্কা প্রথার অবসান ঘটালে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

নাচোল বিদ্রোহ:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও নাচোল—এই পাঁচটি থানা নিয়ে গঠিত হয় নবাবগঞ্জ মহকুমা। ১৯৪৭-পরবর্তী তেভাগা আন্দোলনের পর পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষকদের আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। একমাত্র নাচোল ছিল ব্যতিক্রম ছিল নাচোল। এই থানার চণ্ডীপুর গ্রামকে কেন্দ্র করেই কৃষক আন্দোলন নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করে। এই গ্রামের সাঁওতাল নেতা মাতলা সরদারই এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজহার হোসেন প্রমুখ। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল চণ্ডীপুর। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি কৃষক সমিতির নেতাদের ডাকে দলে দলে কৃষক ফসল কাটার কাজে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।[১২৬] পুলিশ বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক সাঁওতাল কৃষক ও চার পুলিশকর্মীর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার পরে পুলিশের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। গ্রেফতার হন ইলা মিত্র, আজহার হোসেন,

অনিমেষ লাহিড়ী। জেলের মধ্যে ইলা মিত্রের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোনো তথ্য পুলিশকে দেননি। প্রাদেশিক বিধান পরিষদেও সরকার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করে। এমনকি সরকারি নিষেধাজ্ঞার জন্য কোনো সংবাদপত্রেও এই ঘটনা প্রকাশিত হয়নি। এইভাবে সরকার নাচোল বিদ্রোহ সম্পর্কে সমস্ত রকম তথ্য গোপন করে বিষয়টিকে চাপা দিয়ে দেয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি আন্দোলন ছাড়াও খুলনার শোভনা, ধানিবুনিয়া, কালশিরা প্রভৃতি জায়গায় সশস্ত্র আন্দোলন ঘটে। তবে এই কৃষক আন্দোলন সরকারকে সেভাবে বিচলিত করতে পারেনি কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সরকার উচ্ছেদের স্লোগানকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ সেভাবে বিশ্বাস করেননি। তাছাড়া এই আন্দোলন হঠাৎ করেই সংগঠিত হওয়ার জন্য সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে এই আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা হিন্দু হওয়ায় সরকার সাম্প্রদায়িকতার মতো ইস্যুকে এই আন্দোলন ধ্বংসের ক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। এই আন্দোলন সমসাময়িক কয়েকটি অঞ্চলের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সংগঠিত হয়েছিল। সমগ্র দেশব্যাপী কৃষকদের মৌলিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আন্দোলনের নেতারা কোনো দিশা দেখাতে পারেননি। সে-জন্য এই কৃষক আন্দোলন পূর্ব-বাংলার জনমানসে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

৩.খ.ই. পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলন

প্রত্যেক অর্থনীতিতেই জনগণের নানারকম দল, উপদল থাকে যারা নিজেদের পেশাগত স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য সংগঠিত হতে চায়। যখন পেশাগত সম্মিলন ঘটে তখন অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বঞ্চিত শ্রেণি তথা শ্রমিক শ্রেণি ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করে। এই সংঘবদ্ধ মানসিকতাই জন্ম দেয় শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের। ১৯৪৭-পূর্ববর্তী অখণ্ড ভারতবর্ষে শ্রমিকদের অন্যতম সংগঠন ছিল ‘সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC)। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অগাস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান গঠিত হলে এই

সংগঠনের বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জে 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর পূর্ব-পাকিস্তান শাখা দু-দিনের একটি সম্মেলন আয়োজন করে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন। এই সম্মেলনেই ২৮ সেপ্টেম্বর ২৮ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' (EPTUF) নামে একটি নতুন শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত হয়। ডক্টর মালেক ও ফয়েজ আহমদ যথাক্রমে এই সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১২৭] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নে'র সহ-সভাপতি মাহবুবুল হক শিল্প-ব্যবস্থা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন—"শিল্পে উৎপাদন ক্রমাগত নীচের দিকে যাইতেছে। সরকারি অফিসসমূহে, রেলওয়ে, স্টীমার, পোষ্ট অফিসসমূহে Efficiency শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।....শিল্পে জাতীয়করণের কোন লক্ষ্যই নাই। বিদেশী পুঁজিপতিসমূহ একের পর এক পাকিস্তানের সমস্ত শিল্প দখল করিয়া বসিতেছে, বাজারে বিদেশী পণ্যের ছড়াছড়ি। গৃহশিল্প উন্নয়নের কোন প্রোগ্রাম নাই।"[১২৮] ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১ ও ২ মে নারায়ণগঞ্জে ডক্টর মালেকের সভাপতিত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অমর ব্যানার্জী শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ কমিয়ে স্বনির্ভরতার উপর জোর দেন। তিনি বলেন শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয় মূলধন পাকিস্তানে রয়েছে। সরকারের উচিত যথাযথ উপায়ে খাজনা আদায় ও সম্পদ সংগ্রহ করা। আঞ্চলিক শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার উপরেও তিনি জোর দেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান' (TUFP) নামে একটি নতুন শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়। নূরুল হুদা ও কামরুদ্দীন আহ্মদ যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল এক চুক্তির মাধ্যমে নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (APTUF) এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পাকিস্তান (TUPF) একত্রিত হয়ে 'নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন' নামে একটি নতুন শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হয়। নবগঠিত এই ফেডারেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন নূরুল হুদা, সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন

কামরুদ্দীন আহমদ, ফয়েজ আহমদ হন সাধারণ সম্পাদক। ডক্টর মালেক পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর সমগ্র পাকিস্তানের শ্রমিকদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরির প্রচেষ্টা করেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান কনফেডারেশন অব লেবার (APCOL) নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। খাতিব ও ফয়েজ আহমদ যথাক্রমে এই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১২৯] সাংগঠনিক কার্যের সুবিধার্থে এই নতুন সংগঠন 'পশ্চিম পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' নামে দুটি আঞ্চলিক সংগঠনে বিভক্ত হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার'-এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে বক্তাগণ পাকিস্তানের শিল্প বিকাশে সম্পদ, সরকার ও শ্রমিকদের মধ্যে সুষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দেন। যদিও এই সংগঠনের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ এই সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারপন্থী শ্রমিক নেতাদের অধীনে। ফলে শ্রমিকদের বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের স্বার্থরক্ষায় এই সংগঠন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর ১৯৫১ খিস্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র পাকিস্তানে বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বস্তরের শ্রমিকদের মধ্যেই সরকারের প্রতি অসন্তোষ দানা বাঁধে। ফলস্বরূপ এই সময় পেশাগত দিক থেকে একাধিক সংগঠন তৈরি হয় ও আন্দোলন সংগঠিত হয়। সেগুলির বিবরণ প্রদত্ত হল।

রেল শ্রমিক আন্দোলন:- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' গঠিত হওয়ার পর থেকেই 'পূর্ব পাকিস্তান রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এই ফেডারেশনের অধীনে ছিল। এটি নিয়ন্ত্রিত হত পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দ্বারা। দেশ বিভক্ত হলেও আদর্শগত দিক থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ঐক্য রক্ষা করে আসছিল। এর জন্য ১৯৪৯

খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ ভারতে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট ডাকলে পূর্ব-পাকিস্তানেও 'রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'কে না জানিয়েই ধর্মঘটের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ অগাস্ট 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন', 'রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'কে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে। এর ফলে রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাকিস্তানের রেল শ্রমিকরা নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে একটি নতুন সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৭ ডিসেম্বর ঢাকা শহরের রেল মজদুরদের নিয়ে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনেই নূরুল হুদার নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ' নামে একটি নতুন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়।[১৩০] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর লালমনির হাটে 'পূর্ব পাকিস্তান রেল এমপ্লয়িজ লীগ' একটি শ্রমিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের ছাঁটাই নীতি, বেতন কমিশন কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারি উদাসীনতা, রেল কর্মীদের উপর পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে 'পূর্ব পাকিস্তান রেল এমপ্লয়িজ লীগে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে রেল শ্রমিক ছাড়াও ডাক বিভাগের শ্রমিকরাও যোগদান করেন। সম্মেলনের শেষে গৃহীত প্রস্তাবে পে-কমিশনসহ বিভিন্ন দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল।

ডাক শ্রমিক আন্দোলন:- ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে পাকিস্তান পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১৩১] এই অধিবেশনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিসহ পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলনে ডাক কর্মীদের দুরবস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথা তুলে ধরা হয়।

অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সতেরোটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, মফস্বলে কর্মরত কর্মীদের জন্য অতিরিক্তসুবিধাসহ দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বদলির দাবি জানানো হয়। এই দাবিগুলি না মানা হলে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সিলেটের জিন্নাহ্ হলে নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি নূরুল হুদার সভাপতিত্বে নিখিল পাকিস্তান পোস্টম্যান ও লোয়ার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র পাকিস্তানের ডাক কর্মীরা এই সম্মলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর সিলেটের দুর্গাকুমার পাঠশালায় 'নওবেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে পাকিস্তান পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সিলেট জেলা শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠত হয়।[১৩২] এই সভায় ইউনিয়নের প্রাদেশিক সম্পাদক গোলাম মুর্তজা ডাক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে বর্তমান সরকারের সঙ্গে আপসনীতি চালানো সম্ভব নয়। সে-কারণে এই ইউনিয়ন সরকারের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় হাঁটতে প্রস্তুত। কর্মীরা এই প্রস্তাবের সাড়া দিয়ে বছরের শেষে অনুষ্ঠিত এক সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতি মাসের ১৫ তারিখে বেলা ৯ টা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত প্রতীক ধর্মঘট করবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেও তারা সরকারের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ-বিষয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি প্রচারপত্রও দেন যাতে দেখা যায় যে, সরকার তাঁদের প্রতি কতটা উদাসীন ও বিমুখ। প্রচারপত্রে বিভিন্ন বৈষম্যেরও উল্লেখ করা হয়েছিল।

চা শ্রমিক আন্দোলন:- অবিভক্ত ভারতবর্ষে যে-সমস্ত এলাকায় চা উৎপাদন হত তার মধ্যে কেবল সিলেটেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিভাগ-পরবর্তী ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। এই সিলেট জেলায় যে-সমস্ত কর্মীরা কাজ করত তারা অধিকাংশই ছিল বহিরাগত। কাজের সুবাদে তারা চা বাগান সংলগ্ন এলাকাতেই বসতি স্থাপন করে জন্মভিটে থেকে ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। বিভাগের সময় প্রায় একলক্ষ কর্মচারী সিলেটের এই চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

নারী ও পুরুষ উভয়েই চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তবে তাঁদের মজুরিগত বৈষম্য ছিল। পুরুষরা যেখানে দিনে ৪৪ পয়সা মজুরি পেতেন, সেখানে নারীরা পেতেন মাত্র ৩৭ পয়সা।[১৩৩] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চা বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের চাল সরবরাহ বন্ধ করে দিলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। চাল সরবরাহের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সিলেটের চা বাগানগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ায় মালিক পক্ষ বাগানের ম্যানেজারদের স্টোরিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি সিলেটে পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে পাকিস্তান চা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩৪] এই সময় সরকারের পক্ষ থেকে চা বাগান কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়নে'র সম্পাদক সিলেটের চা বাগানগুলি পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায় শ্রমিকদের জন্য সরকার যে রেশনের ব্যবস্থা করেছিল তা অতি নিম্নমানের। এতে সরকারের প্রতি শ্রমিকদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই কুলাউড়ায় পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে শ্রীহট্ট জেলা চা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যে-সমস্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল সেগুলি হল—"(১) নারী শ্রমিকদের কাজের সময় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিশু সদনের ব্যবস্থা করা। (২) বহু বাগানে কোদাল, চাকু ইত্যাদি হাতিয়ারপত্র বহু পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ায় কাজের অসুবিধা হয় ও বেশি সময় লাগে। এ জন্যে নোতুন চাকু, কোদান ইত্যাদি সরবরাহ করা। (৩) পাতা তোলার জন্য মেয়েদের কাপড়ের টুকরো বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মেয়েদের নিজস্ব কাপড়ের ক্ষতি হয়। এজন্য পূর্ব নিয়ম মতো টুকরো কাপড় আবার সরবরাহ করা।"[১৩৫] বলাবাহুল্য এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোনো দূরদর্শিতা ছিল না। কারণ এখানে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোনো রকম প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার

প্রতিফলন এই সম্মেলনে দেখা যায়নি। সে-কারণে এই সম্মেলন সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

সূতাকল শ্রমিক আন্দোলন:- বিশ শতকের তিনের দশকের মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত ভারতে নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষা নদীর তীরে ১নং ঢাকেশ্বরী মিল ও লক্ষীনারায়ণ কটন মিল এবং তারপর ২নং ঢাকেশ্বরী মিল ও চিত্তরঞ্জন মিলের সহযোগিতায় সূতাকল শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এই সময় পূর্ব-বাংলার সূতাকল শ্রমিকদের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন ছিল 'বেঙ্গল টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়ন'। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের এই শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে নিয়মিত মজুরি ও কাজের দাবিতে আন্দোলন চলত। দেশ বিভাগের পর ২নং ঢাকেশ্বরী মিলের প্রায় ৪০০ কর্মী ছাঁটাই হয়ে যান, কিছু শ্রমিক দেশত্যাগও করেন। কিন্তু তাতে শ্রমিক সংগঠনে ফাটল ধরেনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এই সময় নারায়ণগঞ্জে 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে'র কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট সদস্যদের মতবিরোধ ঘটায় রেল ইউনিয়ন, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, রিক্সা চালক ইউনিয়নসহ একাধিক সংগঠন এই ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত হয়। এই তালিকায় সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নও ছিল। এই ঘটনার পরে সরকারিভাবে না হলেও কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব-পাকিস্তানে কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারি তরফে অত্যাচার শুরু হয় কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর। এরপর সরকার সমর্থিত 'পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' কমিউনিস্ট পরিচালিত ও তাদের বিরোধী সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন চালালে সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।

সিমেন্ট শ্রমিক আন্দোলন:- সিলেট জেলার ছাতকে অবস্থিত 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ফ্যাক্টরি' ছিল অবিভক্ত বাংলার একমাত্র সিলেন্ট কারখানা। দেশ বিভাগের পর ছাতক পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে এই সিমেন্ট ফ্যাক্টরিও পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই

ফ্যাক্টরির মালিকানা ছিল ভারতের হাতে। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর এই ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট করেন।[১৩৬] শ্রমিকদের দাবি ছিল বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ, সর্বনিম্ন বেতন ৩৫ টাকা করা, দিন মজুরির পরিবর্তে মাসিক বেতন চালু করা, শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ এই সিমেন্ট ফ্যাক্টরির শ্রমিক নেতা দ্বিজেন সোমকে গ্রেফতার করা হলে শ্রমিকরা তার প্রতিবাদে ১৯ মার্চ এই সভার আয়োজন করে এই ঘটনার নিন্দা করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল অবিভক্ত আসাম মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানির শ্রমিক ইউনিয়নের নবম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির মালিকপক্ষের কাছে যে দাবিগুলি পেশ করেছিল সেগুলি হল—

"১) সর্বনিম্ন মাসিক মূল বেতন ৫৫ টাকা।

২) নগদ ভাতা মাসিক ৩৫ টাকা ও বর্তমান মূল্যে প্রয়োজন অনুযায়ী রেশন এবং ছুটির সময়ের পুরা রেশন দিতে হইবে।

৩) সর্বনিম্ন বেতন যে হারে বাড়িবে সেই হার সকলের মূল বেতন বৃদ্ধি।

৪) যে সকল শ্রমিক ও কর্মচারীর মূল বেতন দক্ষতার তুলনায় অল্প দেওয়া হইতেছে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি।

৫) বেতনসহ ক্ষতিপূরক ছুটি।.......

১০) বিনা বেতনে স্কুলের নিজস্ব গৃহে প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[১৩৭]

সিলেট মুসলীম লীগের কয়েকজন নেতা এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। ক্রমে তাঁরাই এই শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেন। এই সময় সিমেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নে কমিউনিস্ট প্রভাব না থাকায় এবং সরকার বিরোধী কোনো সংগঠন না থাকায় সরকারপন্থী মুসলিম লীগের নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে সূতাকল শ্রমিকদের আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধতে

পারেনি। দেখা যাচ্ছে **১৯৫২**-র পূর্বে অনেক শ্রমিক আন্দোলনই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কারণে সফল হতে পারেনি।

ডক শ্রমিক আন্দোলন:- চট্টগ্রাম বন্দরে কয়েক হাজার শ্রমিক কর্মরত থাকলেও তাঁদের কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ডক শ্রমিকরা মাত্রাতিরিক্ত শোষণের শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে **১৯৪৯** খ্রিস্টাব্দের **১৪** অগাস্ট চট্টগ্রাম বন্দরের ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।[১৩৮] তাঁদের এই ধর্মঘটের চাপে মালিক পক্ষ তাদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেয়। কিন্তু পুনরায় তারা বৈষম্যের শিকার হয়। **১৯৫০** খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে চট্টগ্রাম বন্দরের **১০** হাজার শ্রমিক 'পূর্ব বাঙলা' সরকারের শ্রমমন্ত্রী ও লেবার কমিশনারের কাছে এক খোলা চিঠিতে তাদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন—''আমরা কাহার কাজ করি, আমাদের মনিব কে, তাঁহাকে আমরা চিনি না। মনিবও আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখে না। অথচ দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি পোর্টেই বিভিন্ন কোম্পানীর স্থায়ী মজুর রেজিষ্টার আছে। পাকিস্তানে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?...ঘরের অভাবে আমরা অর্ধেকেরও বেশী থাকি খোলা মাঠে। জনের ভাগ পড়ে সোয়া হাত হইতে দেড় হাত জায়গা। এইটুকু জায়গায় মালিকদের বাড়ির বিড়াল কুকুররেরাও কি থাকিতে পারিবে?''[১৩৯] কিন্তু সরকার এই পত্রের কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এরপর **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়ে চরম পত্র প্রদান করলেও সরকারপক্ষ তা উপেক্ষা করে। আসলে ডক শ্রমিকদের শক্তিশালী কোনো সংগঠন না থাকায় তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকার আগাগোড়া উদাসীন থেকেছে।

তৈল শ্রমিক আন্দোলন:- দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব তৈল শিল্প বলতে কিছু ছিল না। বার্মা ওয়েল কোম্পানি বিদেশ থেকে তৈল আমদানি করে পূর্ব-পাকিস্তানে বণ্টন করত। বার্মা ওয়েল কোম্পানির অফিস ছিল চট্টগ্রামে। সেখানে এই কোম্পানির শ্রমিকদের

একটি ইউনিয়ন ছিল। প্রায় তিন বছর ধরে এই শ্রমিকরা তাঁদের ন্যূনতম দাবি আদায় করতে না পেরে **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দের **১৫** জানুয়ারি জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে।।[১৪০] এই সভায় তাঁরা বেতন বৃদ্ধি, সাধারণ ছুটি, চিকিৎসাজনিত ছুটি, বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগসহ একাধিক দাবির কথা তুলে ধরেন। এই দাবি না মানলে তাঁরা **১** ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দেন। কিন্তু মালিকপক্ষ এই দাবি মেনে না নেওয়ায় শ্রমিকরা প্রতিশ্রুতি মতো **১** ফেব্রুয়ারি থেকে ধারাবাহিক ধর্মঘট শুরু করেন। প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাবার পর মালিক পক্ষ শ্রমিকদের প্রধান দাবিগুলি মেনে নেয়। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এক টাকা চার আনা থেকে এক টাকা ছয় আনা করা হয়, মাসিক বেতন হয় ৮৬.৬২ টাকা, বছরে **১৭** দিনের পরিবর্তে **২৭** দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়। কোম্পানির এলাকার বাইরে শ্রমিকদের সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়।[১৪১] মালিক পক্ষের এই সিদ্ধান্ত থেকে দেখা যায় শক্তিশালী কোনো সংগঠন না থাকলেও কেবল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বন্দরের শ্রমিকরা যে সাফল্য অর্জন করেছিল তা এই সময়ের অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকরা পায়নি। কারণ এর পূর্বে রেল, সূতাকল, চা শিল্পের শ্রমিকরা আন্দোলন করলেও সরকারের মনে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেদিক থেকে তৈল শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে সফল বলা যায়।

বাটা শ্রমিক আন্দোলন:- ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বাটা কোম্পানির এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন। এই সময় শ্রমিকরা কর্মসংস্থানের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ও বাটা কোম্পানির কাছে আবেদন জানালেও তাঁদের আবেদনে কেউ কর্ণপাত না করায় তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলন চলাকালীন বাটা শ্রমিকরা **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দের **২০** জানুয়ারি ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সভায় মিছিল সহকারে প্রবেশ করেন।[১৪২] শ্রমিকরা ভেবেছিলেন মুসলিম লীগের সদস্যরা তাঁদের দাবিগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে ফলে তাঁরা বাটা কোম্পানির উপর চাপ

বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিপরীত। মুসলিম লীগ সদস্যরা বাটা শ্রমিকদের উপর অমানুষিক প্রহার করে তাদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই অত্যাচার প্রসঙ্গে সমালোচক বদরুদ্দীন উমর এস.হক নামক এক বাটা শ্রমিকের যে প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন তা হল—‘‘মুসলিম লীগ অসহায় বাটা শ্রমিকদের উপর নির্মম প্রহার চালিয়ে আর একটা কলঙ্কিত ইতিহাসের সৃষ্ট করলো। মুসলিম লীগ তার বীভৎস মূর্তি আবার দেশবাসীকে দেখালো। ভালোই হলো, বাটা শ্রমিকরা দেখলো, আমরা দেখলাম, দেশবাসী দেখলো বুঝলো, আর একবার, মুসলিম লীগ জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়-মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জন্য যারা ত্যাগ করেছে তাদের উপর লাঠি চালায়।’’[১৪৩] নিজেদের দাবি পূরণ না হওয়ায় বাটা শ্রমিকরা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল থেকে ‘বাটার জুতো বয়কটের’ আন্দোলন শুরু করেন। ‘পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগে’র সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ সংবাদ পত্রে এক বিবৃতিতে বাটা শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ২৯ অক্টোবর ভারত থেকে আগত কর্মচ্যুত বাটা শ্রমিকরাও এই আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেশের জনসাধারণকে বাটার জুতো না কেনার অনুরোধ করেন। এই ঘটনা জনসাধারণের মনে প্রভাব ফেললেও বাটা কোম্পানি ও সরকারের উপর কতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিল তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সবমিলিয়ে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এই চার বছরে পাকিস্তান সরকার শ্রমজীবী মানুষের চাওয়া পাওয়াকে কোনো প্রকার গুরুত্ব না দেওয়ায় জনগণের মধ্যে পাকিস্তান তথা পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে। কিন্তু নবগঠিত এই গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যক্রম খুব একটা মসৃণ ও দীর্ঘ হয়নি। তাই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটলে দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। ক্ষমতা দখল করেন আইয়ুব খান। তাঁর দশ বছরের শাসন ক্ষমতার প্রথম পাঁচ বছরে কোনো সংগঠন পূর্ব-পাকিস্তানে সেভাবে মাথা চাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু শিক্ষা বিলকে কেন্দ্র করে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজের অন্যান্য শ্রেণিও ছাত্রদের আন্দোলনকে

সমর্থন করায় সরকার-বিরোধী একটা ঐক্যবদ্ধ জনমত গড়ে ওঠে। এর পর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের 'ছয় দফা' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে ক্ষমতা থেকে সরতে বাধ্য হন আইয়ুব খান। আইয়ুব খানের এই শাসনপর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে শাসক-বিরোধী যে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময়পর্বে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির দ্বারা ডাকা ধর্মঘটের পরিসংখ্যান থেকে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে যে-সমস্ত ধর্মঘট আহুত হয়েছিল তা নিম্নরূপ—[১৪৪]

<u>১৯৬৪-৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির আহুত ধর্মঘট</u>

ধর্মঘটে আহ্বানকারী শ্রেণি/দল	ধর্মঘটের সংখ্যা		%	
ছাত্র	১০৬		২৪.৮৮	
কর্মজীবী (অফিস/দোকান)	১১৫		২৭.০০	
পেশাজীবী শ্রেণি	৬০		১৪.০৮	
শিল্প শ্রমিক	১০৫	]২৮১	২৪.৬৫	]৬৫.৯৬
অন্যান্য শ্রমিক	৪২		৯.৮৬	
মোট	৪২৬		১০০.০০	

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের ক্ষমতার অবসান ঘটলে মেজর জেনারেল ইয়াহিয়া খান শাসন ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু 'ছয় দফা' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যে গণ-জাগরণ ঘটেছিল সেই আবহেই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় শ্রমিকরা জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। ঢাকাসহ প্রান্তবর্তী সকল জেলার শ্রমিকরা এই আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ বাঙালি শ্রমিকরা দীর্ঘকাল অবাঙালি মালিক পক্ষ ও সরকারের কাছ থেকে যে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন তা তাঁদের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল।

প্রথমদিকে তাঁদের এই ক্ষোভের কারণ ছিল অর্থনৈতিক কিন্তু পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক রূপ লাভ করে এবং শাসক বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। শ্রমিক-জনতার এই মিলিত সংগ্রামেরই ফল **১৯৭১**-এর স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সূত্রনির্দেশ:

১. বদরুদ্দীন উমর, ''পূর্ব বাঙলায় মহম্মদ আলী জিন্নাহ্', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ৯৪

২. বদরুদ্দীন উমর, ''ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও পরবর্তী পর্যায়'', তদেব, পৃ. ২৪৩

৩. বদরুদ্দীন উমর, ''পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খন্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৪২

৪. তদেব, পৃ. ২২৬

৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, প্রথম খন্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ১৭

৬. বদরুদ্দীন উমর, ''সাক্ষাৎকার'', 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল (দ্বিতীয় খণ্ড)', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৫, পৃ. ১৫৯

৭. ড. মোহাম্মদ হাননান, ''১৮৩০-১৯৫২'', 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ ২০০০, পৃ. ৮৮

৮. তদেব, পৃ. ৮৩

৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মসূচি'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, প্রথম খন্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৭

১০. তদেব, পৃ. ৪৮

১১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ঘোষণাপত্র'', তদেব, পৃ. ২১২

১২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''শামসুল হক কর্তৃক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম প্রস্তাবিত ম্যানিফেস্টো'', তদেব, পৃ. ১১৮

১৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিশের পুস্তিকা'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, প্রথম খন্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৯

১৪. বদরুদ্দীন উমর, ''প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ৬০

১৫. নিগার চৌধুরী, ''রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাঙালী বুদ্ধিজীবী, ছাত্রজনতার প্রতিক্রিয়া'', 'বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯১, পৃ. ২৯

১৬. তদেব, পৃ. ৩১

১৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''জন সংহতি সম্পর্কে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্র বক্তব্য'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, প্রথম খন্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ৭৯

১৮. বদরুদ্দীন উমর, ''নাজিমুদ্দীন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ১১০

১৯. গাজীউল হক, 'একুশের সংকলন' ৮০: স্মৃতিচারণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১১৫

২০. আবদুল মতিন, আহমদ রফিক, ''একুশে ফেব্রুয়ারি : সূর্যবিস্ফোরণের দিন'', 'ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮০

২১. বদরুদ্দীন উমর, ''খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতা ও তার প্রতিক্রিয়া'', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খন্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৫৬

২২. গাজীউল হক, 'একুশের সংকলন' ৮০: স্মৃতিচারণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১৪১

২৩. এম. আর. আখতার মুকুল, ''পঞ্চাশের দশকে আমরা'', 'পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন', সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৯১, পৃ. ৩১

২৪. বদরুদ্দীন উমর, ''ভাষা আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়'', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খন্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৭২

২৫. আবুল মনসুর আহমদ, ''যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা'', 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনঃমুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ২৪৬

২৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৭১)', ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ১৮৩

২৭. ড. মো. মাহবুবর রহমান, ''পাকিস্তানের রাজনীতি, ১৯৬২-৬৬'', 'বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১', সময় প্রকাশন, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানিয়ারি ২০১২, পৃ. ১৭৭

২৮. আবুল ফজল হক, 'বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৫৮

২৯. সাঈদ উর রহমান, ''রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮৭

৩০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''৬-দফা কর্মসূচী'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৭১)', ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ২৬৯-২৭৪

৩১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ'',, পৃ. ৩০০

৩২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার'', তদেব পৃ. ৩০৫

৩৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ছাত্রনেতার যুক্ত বিবৃতি'', পৃ. ৪০৪

৩৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''আটটি বিরোধী দলের উদ্যোগে গঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠিত-আন্দোলনের আহ্বান'', তদেব, পৃ. ৪০৬

৩৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''রেসকোর্সের গণসম্বর্ধনায় শেয মুজিব'', তদেব, পৃ. ৪৪০

৩৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস'', তদেব, পৃ. ৫৩১-৫৩২

৩৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল'', তদেব, পৃ. ৫৯৩

৩৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''ভুট্টোর ঘোষণা'', তদেব, পৃ. ৫৯৬

৩৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ'', তদেব, পৃ. ৬৭০

৪০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ'', তদেব, পৃ. ৭০৫

৪১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড, মুজিবনগর: প্রশাসন', ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ১

৪২. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ''তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'', 'একাত্তরের দশ মাস'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৩৪

৪৩. বিমল প্রামাণিক, ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতবাসী'', 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা', পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৯

৪৪. বশীর আল্‌হেলাল, ''সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট'', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, পৃ. ১০৭

৪৫. হুমায়ুন আজাদ, ''পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ'', 'ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ২

৪৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথমখণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৬৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ১৩

৪৭. বদরুদ্দীন উমর, ''সূত্রপাত'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি(প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ২৬

৪৮. তদেব, পৃ. ২৭

৪৯. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সংগঠন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ৪২

৫০. তদেব, পৃ. ৭৬

৫১. সাঈদ-উর রহমান, ''সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৮

৫২. হাসান মুরশিদ, ''বাংলা অ্যাকাডেমী'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১২৪

৫৩. তদেব, পৃ. ১২৭-১২৮

৫৪. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সংগঠন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ১০১

৫৫. তদেব, পৃ. ১০৮

৫৬. তদেব, পৃ. ১১৬

৫৭. তদেব, পৃ. ১৩৩

৫৮. হাসান মুরশিদ, ''ছায়ানট'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১৪৪

৫৯. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সংগঠন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ১৩৮

৬০. সাঈদ-উর রহমান, ''সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১১৩

৬১. তদেব, পৃ. ১১৩

৬২. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সংগঠন'' 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ১৫৭

৬৩. বদরুদ্দীন উমর, ''ভাষা আন্দোলন উত্তর ঘটনা প্রবাহ – ১৯৪৮'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ১৪৯

৬৪. বদরুদ্দীন উমর, ''শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৬৫-৬৬

৬৫. সাঈদ-উর রহমান, ''সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫

৬৬. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সম্মেলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ১৯৪

৬৭. তদেব, পৃ. ১৯৭-১৯৮

৬৮. সাঈদ-উর রহমান, ''সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৭

৬৯. তদেব, পৃ. ৩৮

৭০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথমখণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ৩৯০

৭১. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সম্মেলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ২১৯

৭২. অলি আহাদ, 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫', বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ অক্টোবর ২০১২, পৃ. ২২৬

৭৩. বশীর আল্‌হেলাল, 'সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট'', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, পৃ. ১৭০

৭৪. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক সম্মেলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ২৩৮

৭৫. তদেব, পৃ. ২৪৫

৭৬. তদেব, পৃ. ২৪৯

৭৭. হাসান মুরশিদ, ''বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ এবং মহাকবি স্মরণোৎসব'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৭৮. তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৭৯. বশীর আল্‌হেলাল, ''বাংলা ভাষার সংস্কার-প্রয়াস'', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, পৃ. ৬৮৩

৮০. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ৩২৩

৮১. নিগার চৌধুরী, ''বাংলা লিপি পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র'', 'বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালীর সংগ্রাম, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ১৯৯১, পৃ. ৬৪

৮২. বদরুদ্দীন উমর, ''আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ২০৭

৮৩. তদেব, পৃ. ২০৫-২০৬

৮৪. বদরুদ্দীন উমর, ''শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি(তৃতীয় খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৬০-৬১

৮৫. বশীর আল্‌হেলাল, ''বাংলা ভাষার সংস্কার প্রয়াস'', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, পৃ. ৭০৬

৮৬. তদেব, পৃ. ৭০৭

৮৭. তদেব, পৃ. ৭৫৩

৮৮. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ৩৩৭

৮৯. আবুল কাসেম, ''পহেলা পর্ব ১৯৪৭-৪৮ সনের আন্দোলন'', 'একুশের সংকলন'৮০ : স্মৃতিচারণ', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ২৮

৯০. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ৩৩৯

৯১. বশীর আল্‌হেলাল, ''বাংলা লিপি-, বানান-, ও ভাষা-সংস্কারের প্রয়াস'', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩, পৃ. ৭৬৬-৭৬৭

৯২. তদেব, পৃ. ৭৭০

৯৩. হাসান মুরশিদ, ''পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১০৫

৯৪. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ''সাংস্কৃতিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১', জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ জুন ২০০৬, পৃ. ৩৪৮

৯৫. সাঈদ-উর রহমান, ''সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ'', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৯

৯৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ''রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্ত মওলানা ভাসানীর বিবৃতি'', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৭১)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৯০

৯৭. J. RUSSELL ANDRUS, AZIZALI F. MOHAMMED, ''LAND AND PEOPLE", 'THE ECONOMY OF PAKISTAN', STANFORD UNIVERSITY PRESS, STANFORD, CALIFORNIA, 1958, p. 8

৯৮. এম এম আকাশ, ''বাংলাদেশ : ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ'', 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৫৯

৯৯. আতিউর রহমান, লেলিন আজাদ, ''পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক অর্থনীতি ও পূর্ব-বাংলার ভাষা-আন্দোলন'', 'ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ৯৯

১০০. J. RUSSELL ANDRUS, AZIZALI F. MOHAMMED, ''LAND AND PEOPLE", 'THE ECONOMY OF PAKISTAN', STANFORD UNIVERSITY PRESS, STANFORD, CALIFORNIA, 1958, p. 23

১০১. এম এম আকাশ, ''বাংলাদেশ : ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ'', 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬৩

১০২. GHAZI MUMTAZ FAROOQ, ''Labor Force Participation Rates in Pakistan: 1901-1961'', 'The Pakistan Development Review", Volume 8, Issue 1, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, 1968, p. 81

১০৩. Austin Robinson, "The Problems of Longer-term Planning: Agriculture Development", 'Economic Prospects of Bangladesh', Overseas Development Institute Limited, London, 1973, p. 16

১০৪. J. RUSSELL ANDRUS, AZIZALI F. MOHAMMED, "THE PRODUCTION AND MARKETING OF FOOD CROPS", 'THE ECONOMY OF PAKISTAN', STANFORD UNIVERSITY PRESS, STANFORD, CALIFORNIA, 1958, p. 37

১০৫. J. RUSSELL ANDRUS, AZIZALI F. MOHAMMED, "LAND TENURE", Ibid, p. 119

১০৬. J. RUSSELL ANDRUS, AZIZALI F. MOHAMMED, "IRRIGATION AND SOIL PROBLEMS", Ibid, p. 79

১০৭. এম এম আকাশ, "বাংলাদেশ : ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ", 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬৭

১০৮. RAJENDRA PRASAD, "RESOURCES OF THE MUSLIM STATES", 'INDIA DIVIDED', HIND KITAB LTD, BOMBAY, Third Edition Revised, July 1947, p. 29

১০৯. AZIZUR RAHAMAN KHAN, "Problems of Jute Marketing in East Pakistan", 'The Pakistan Development Review', Volume 1, Issue 2, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, 1961, p. 81

১১০. এম এম আকাশ, "বাংলাদেশ : ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ", 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৭১

১১১. তদেব, পৃ. ৭৩

১১২. JR. STEPHEN, R. LEWIS, S. MUSHTAQ HUSSAIN, "Relative Price Changes and Industrialization in Pakistan: 1951-1964", 'The Pakistan Development Review', Volume 6, Issue 1, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, 1966, p. 412

১১৩. JAMILA AKHTAR, ‘‘Literacy and Education: Fifth Release From the 1961 Census of Pakistan’’, ‘The Pakistan Development Review’, Volume 3, Issue 3, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, 1963, p. 428

১১৪. M. S. JILLANI, ‘‘Changes in Levels of Educational Attainment in Pakistan: 1951-1961’’, ‘The Pakistan Development Review’, Volume 4, Issue 1, Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, 1964, p. 88

১১৫. Ibid, p. 76-77

১১৬. বদরুদ্দীন উমর, ‘‘পূর্ব বাঙলায় দুর্ভিক্ষ’’, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি(দ্বিতীয় খন্ড)’, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৬, পৃ. ২১

১১৭. তদেব, পৃ. ৪৮

১১৮. তদেব, পৃ. ৫৩

১১৯. তদেব, পৃ. ৭৫

১২০. হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পা.), ‘‘পূর্ব বাংলার লবণ সংকট’’, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র প্রথম খন্ড, পটভূমি(১৯০৫-১৯৫৮)’, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯, পৃ. ২১৯

১২১. বদরুদ্দীন উমর, ‘‘পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন’’, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’(দ্বিতীয় খন্ড), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৪২

১২২. তদেব, পৃ. ১৫৮

১২৩. তদেব, পৃ. ১৫৮

১২৪. তদেব, পৃ. ১৬৩

১২৫. তদেব, পৃ. ১৯০

১২৬. তদেব, পৃ. ২০৯

১২৭. বদরুদ্দীন উমর, ''পূর্ব বাঙলায় শ্রমিক আন্দোলন'', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'(তৃতীয় খন্ড), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৭

১২৮. তদেব, পৃ. ১৯

১২৯. তদেব, পৃ. ২১

১৩০. তদেব, পৃ. ২৬

১৩১. তদেব, পৃ. ৩৪

১৩২. তদেব, পৃ. ৩৫

১৩৩. তদেব, পৃ. ৩৮

১৩৪. তদেব, পৃ. ৩৯

১৩৫. তদেব, পৃ. ৪১

১৩৬. তদেব, পৃ. ৪৫

১৩৭. তদেব, পৃ. ৪৭

১৩৮. তদেব, পৃ. ৫০

১৩৯. তদেব, পৃ. ৫০-৫১

১৪০. তদেব, পৃ. ৫৩

১৪১. তদেব, পৃ. ৫৪

১৪২. তদেব, পৃ. ৫৫

১৪৩. তদেব, পৃ. ৫৫

১৪৪. আতিউর রহমান, ''মুক্তিযুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ'', 'মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫১